খেলাধূলায় বাঙলার মেয়ে

মুকুল

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
অর্ধেন্দু দত্ত

Leela Dey.
B.A., B.T., M.S, (U.S.A).
Inspector of Physical Education &
Youth Welfare (Women),
West Bengal.

EDUCATION DIRECTORATE
Government of West Bengal
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA-1.

শ্রীমুকুল লিখিত "খেলাধূলায় বাংলার মেয়ে" পুস্তকখানি পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। পুস্তকখানিতে যে সব মহিলাদের জীবনী লিখিত হয়েছে—তাঁদের প্রায় অনেকেই আমার বিশেষ পরিচিত—আবার কেউবা ছাত্রী। সুতরাং আনন্দিত বোধ করবার কারণ আছে।

গত তিরিশ বছর ধরে বাংলার খেলাধূলার জগৎ, বাংলার মেয়েদের দেশে বা বিদেশে প্রতিযোগিতার জন্য, যে আহ্বান জানিয়েছিল—সে আহ্বানে সাড়া দিতে গ্রামের মেয়ে, সহরের মেয়ে ক'লকাতা নগরীর মেয়ে ছুটে এসেছিল। এঁরা কেহ আজ ঘরের বধূ, কেহ বা ছাত্রী, কেহ বা শিক্ষিকা আর কেহবা জননী। শ্রীমুকুল, তাঁর এই পুস্তকে তাঁদের জীবনী তুলে ধরেছেন—বাংলার পাঠক সমাজের কাছে।

ধারাবাহিক ভাবে যখন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর এই রচনাগুলি প্রকাশিত হ'চ্ছিল—তখন খেলাধূলায় অনুরাগী মহিলা ও ছাত্রীদের এ সম্বন্ধে আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।

যে সব জীবনী এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে—তাঁদের নামগুলি, গত তিরিশ বৎসরের সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের খেলাধূলোর জগৎ থেকে সংগৃহীত হয়েছে—একথা লেখক আমাকে জানিয়েছেন।

এই রচনাগুলির মধ্যে, লেখক মেয়েদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। অনেক জায়গায় তিনি প্রকাশ করেছেন যে এই ক্রীড়াকুশলী মেয়েদের মধ্যে তিনি নারীর কল্যাণময়ী রূপ লক্ষ্য করেছেন। নারীর গুণের বহুবিধ বিকাশ, তিনি এইসব মহিলাদের মধ্যে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। শারীরিক শিক্ষার দিক থেকে লেখকের এই আবিষ্কারটির যথেষ্ট মূল্য আছে। খেলাধূলা আজ শুধু অবসর বিনোদনের জন্য নয়—খেলাধূলা বা শারীরিক শিক্ষা আজ শিক্ষা-তালিকায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শারীরিক শিক্ষা আজ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সূত্রের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মহিলাদের শারীরিক

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য নারীত্বের কল্যাণময় গুণগুলির বিকাশ করা। ক্রীড়া-কুশলী বাংলার মেয়েদের মধ্যে, লেখকের দৃষ্টিতে, নারীর কল্যাণময়ী রূপটি যে ধরা দিয়েছে—এজন্য লেখকের দৃষ্টিকে প্রশংসা করি।

খেলাধূলা সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব আছে। বাংলার মেয়েদের খেলাধূলায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতে—এই পুস্তকখানি যে প্রেরণা দেবে—এ বিষয়ে আমার আশা আছে।

লীলা দে

লেখকের কথা

বাংলার বিগত যুগের জীবনেতিহাস স্মৃতির প্রদীপালোকে ওল্টালে মেয়েদের অনেক ভূমিকাই মূর্ত হবে, যার জন্য বাঙালী জাতি গৌরবান্বিত। নয়নে মায়াঞ্জন থাকলেও, সায়াহ্নে তুলসীমঞ্চে দীপালোক নিবেদন করলেও এ দেশের শ্যামলীকন্যার আরও একটি নাম ছিল। সে ছিল বীরাঙ্গনা।

আজকের যুগেও বাংলার মেয়েদের সে সজীবতা হারায় নি। পূর্ব-গৌরবের আজও তরো অধিকারিনী। বহু বিপর্যয় বয়ে গিয়েছে আমাদের জীবন ও সমাজের ওপর দিয়ে, তবু বাংলার মেয়েরা নানা দিকে বিদ্যাশিক্ষায়, রাজনীতিতে, সমাজসেবায় সর্বত্রই এগিয়ে চলেছে অভ্রান্ত অগ্রগতিতে। ক্রীড়াক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতির চিহ্ন অস্পষ্ট নয়। খেলাধূলায় যে সব বাঙালী মেয়ে খ্যাতি অর্জন করে বাংলা তথা বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর সযত্নে সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে একত্রিত করেছি।

আমাদের দেশে মেয়েদের খেলাধূলা বলতে প্রধানত অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাঁতার, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেব্‌ল টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন খেলা। আজ আগ্নেয় অস্ত্রের খেলাতেও মেয়েরা পারদর্শী; রাইফেল শুটিংয়ে অনেকেই অনন্যা।

এই সব খেলাধূলায় যারা খ্যাতকীর্তি—এই গ্রন্থে তাদের কথাই বলা হয়েছে। কারো কারো জীবনী বাদ না গিয়েছে, এমন নয়। পরে এদেরও গ্রন্থভুক্ত করার ইচ্ছে রইল।

জীবনীচয়ন কালে দেখেছি খেলাধূলার সাধনায় কোন মেয়ের নারীত্বের কমনীয়তা কিছুমাত্র কমে নি। বরঞ্চ শরীর চর্চার ভিতর দিয়ে নারীত্বের সৌন্দর্য একটি সুসমঞ্জস ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। খেলা-পটু বাঙালী মেয়েরা ব্যবহারিক জীবনেও নারীত্বের কাংখিত উন্মীলনে পরম সার্থক। গৃহস্থালির সর্বৈব পরীক্ষায় সহাস্য অপরাজিতা। আদর্শ গৃহলক্ষ্মী। এখানে আলোচিতদের মধ্যে দশ-বারোজন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। অতএব একথা স্বতঃ-প্রমাণিত যে, খেলাধূলার একনিষ্ঠ চর্চায় পাঠচর্চা বা বিদ্যাভ্যাস বিঘ্নত হয় না।

এই গ্রন্থে দুটি জীবনালেখ্য রচনা করেছি পাইলট দুর্বা ব্যানার্জি ও প্যারাসুট জাম্পার গীতা চন্দকে নিয়ে। এ দু'জন বাঙালী কৃতি মহিলা ঠিক

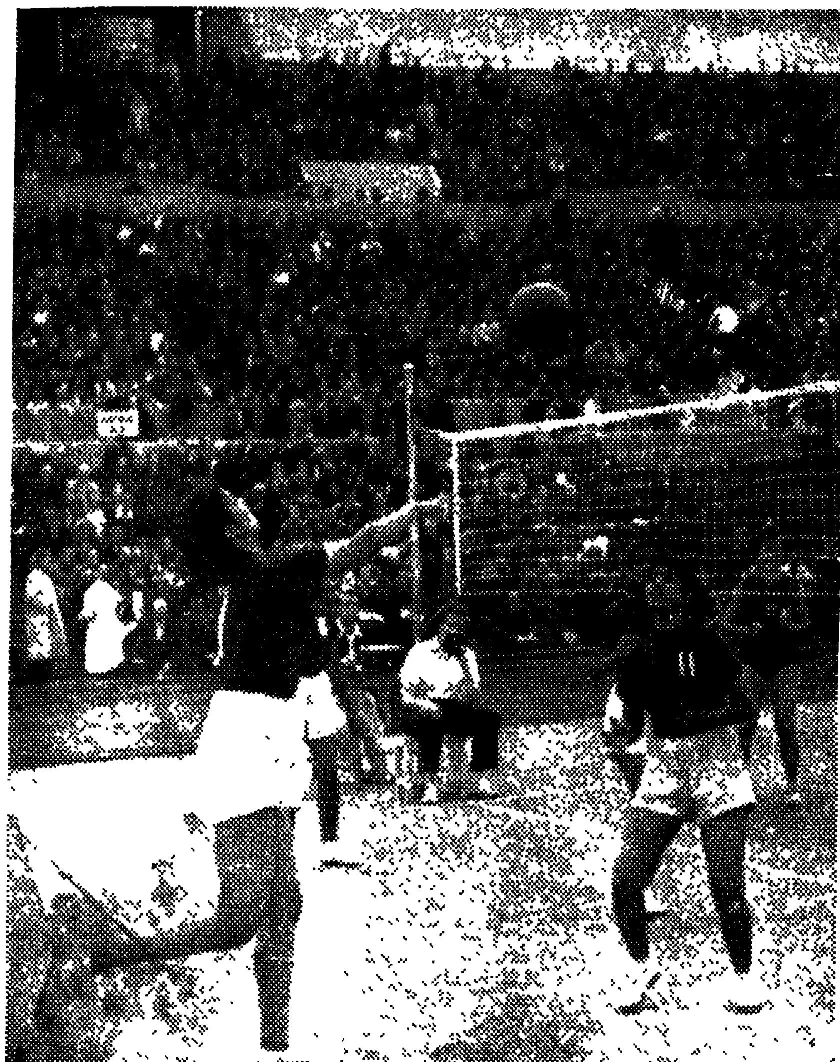
ক্রীড়াপ্রাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এদের প্রসঙ্গ বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্য এরাও এমন কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ক্ষমতায় পারদর্শিনী যা উৎকৃষ্ট ধরনের ক্রীড়ানৈপুন্যের সমগোত্রীয়।

এই বই প্রকাশে সাহায্যের জন্য আমার বন্ধু ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। এই বইয়ের মাল-মশলা ও ছবি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর অকপট সাহায্য পেয়েছি। কিছু রচনায় তাঁর লেখনীরও স্পর্শ রয়েছে। গ্রন্থভুক্ত সবকটি রচনা বাংলা-দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় যখন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন খেলাধূলার অনুরাগী পাঠক পাঠিকাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এই বই লেখায়, আমার অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিল। সুসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং 'দেশ' পত্রিকার সুযোগ্য সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ বাঙালী তনয়াদের এ ধরণের একটি পরিচয়ের রসদ সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আমাকে—তাঁদের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে এগুতে আমি সাহসী হতাম কিনা সন্দেহ। শুধুমাত্র লিখিত ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের কাছে ঋণমুক্ত হতে আমি চাই না। আমার সাংবাদিক জীবনের শিক্ষাগুরু প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীব্রজরঞ্জন রায় ও বন্ধুবর শ্রীপুষ্পেন সরকারের কাছেও আমি ঋণী। এঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

বাঙালী মেয়েরা যে শুধু রান্নাঘরের প্রয়োজন মেটায় না, অন্তত হাজার সামাজিক সংস্কারে যে তাকে পঙ্গু করে রাখা যাবে না, আমাদের জাতীয় জীবনের দিকে দিকে আজ তার অজস্র প্রমাণ। পদাবলীর ছন্দের মত তার মাধুর্য অপরিমেয়, কোমলতায় সে লতার চেয়েও নম্র কিন্তু গৌরব অর্জনের দুরূহতম পরীক্ষায় সে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারিণী। এই গৌরব দিনে-দিনে বাড়ছে। ক্রীড়াজগতে দেখা দিচ্ছে কত নতুন নতুন মেয়ে—নবীন সম্ভাবনা। অন্তত আমার এই বই সেই সম্ভাবনার সোপানে লাজুক বাঙালীতনয়াদের হাতে পথনির্দেশিকার কাজ করুক—এইটুকু কামনা করি।

উৎসর্গ

যাঁর জন্য আমার সাংবাদিক জীবন—সেই—পরম ক্রীড়ানুরাগী, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ সহোদর-সম শ্রীপ্রভাত কুসুম রায়ের কর-কমলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পিত।



১৯৫২ সালে মস্কো স্টেডিয়ামে বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায়
কুমারী মীনাক্ষী চৌধুরী (ডান দিকে)।

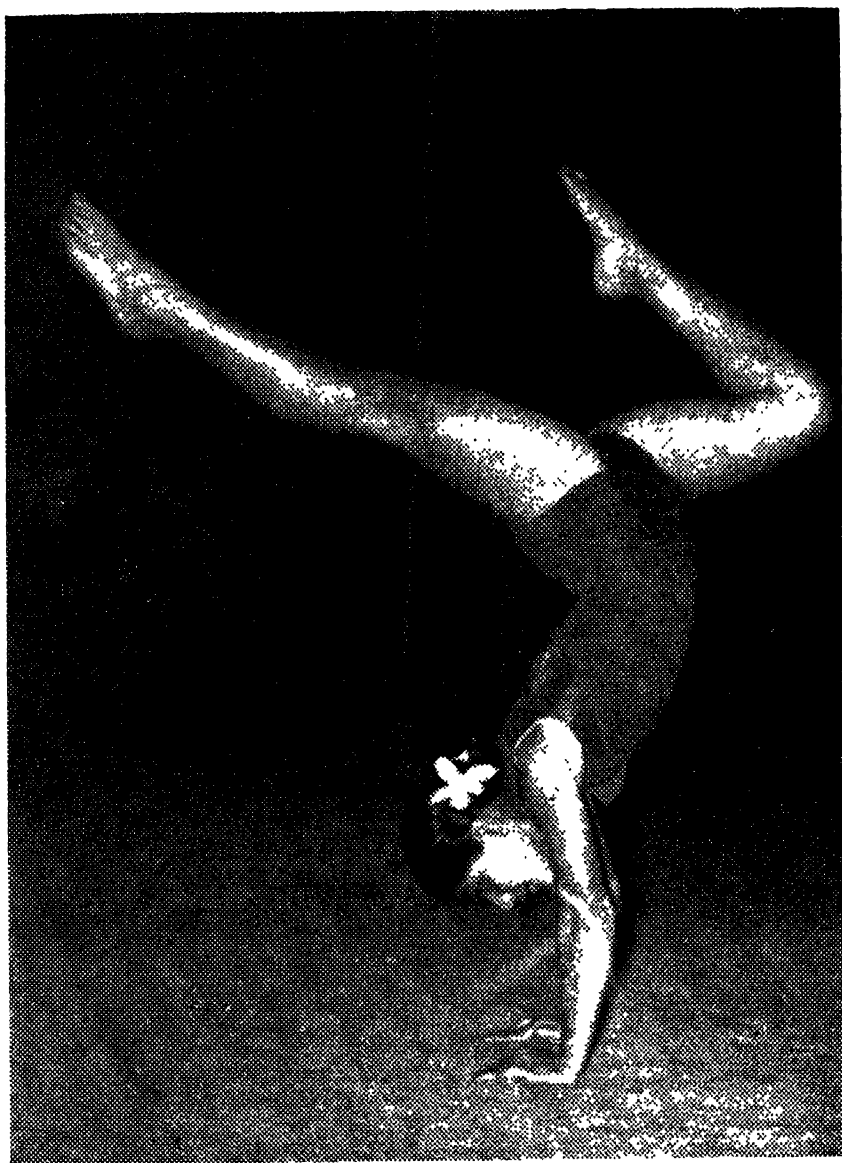


সাঁতারের পরে সমুদ্র সৈকতে রিণা ব্যানার্জি।



নীলিমা ঘোষের হার্ডলস রেস





প্লাস্টিক গার্ল অরুণা দাশগুপ্তার জিমন্যাস্টিকের দৃশ্য।



ডোভারের কোলে আরতি সাহা।



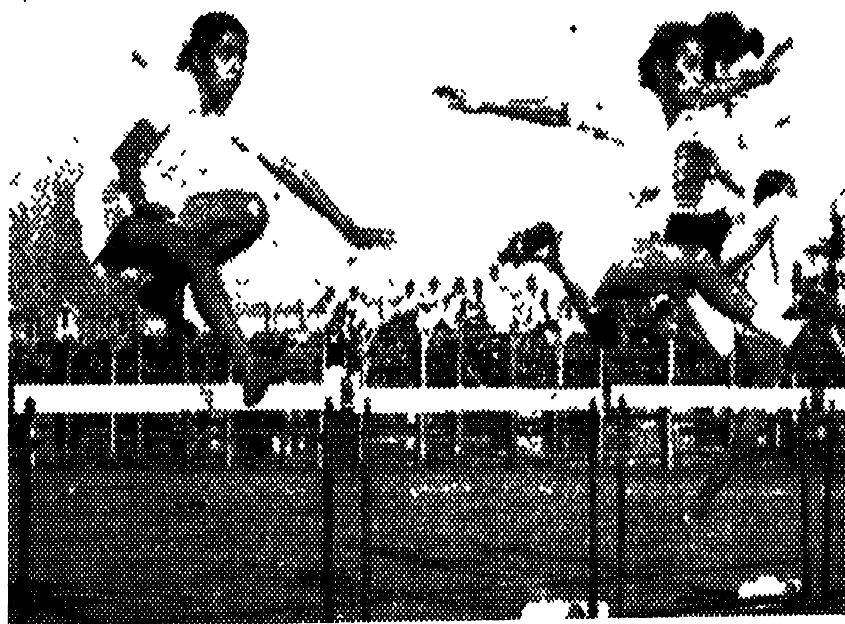
অনীতা মুখার্জির দৌড়ের স্টার্ট নেবার দৃশ্য।



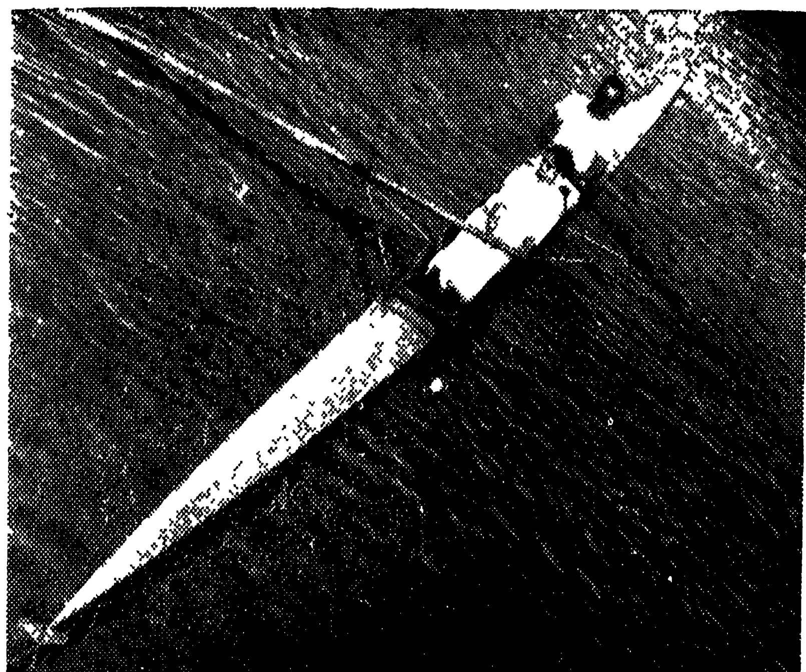
প্যারাট্রুপারের সার্টিফিকেট দেবার সময় বাঙলার মেয়ে গীতা চন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি।



শুটিং জ্যাকেট পরে রাইফেল ছুঁড়ছেন গীতা রায়।



কুমারী নমিতা ঘোষের (ডান দিকে) হার্ডলস রেসের দৃশ্য



ঢাকুরে লেকে স্বামীর সঙ্গে নৌ-বাইচে প্রতিযোগিতা
করছেন গীতা রায়।



নিখিল ভারত রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় কয়েকজন
মহিলার রিভলবার ছোড়ার দৃশ্য।



১৯৬০ সালের অলিম্পিক ট্রায়ালে ভারতের তিন সাঁতার পটিয়সী
বাঁ দিকে বম্বের বন্দনা মাচেণ্ট, মাঝে সন্ধ্যা চন্দ্র
ও ডানদিকে কল্যাণী বসু।



এরোপ্লেনের সামনে পাইলট দূর্বা ব্যানার্জি



অনুরাধা গুহঠাকুরতার ব্রেস্ট স্ট্রোকের ভঙ্গী।

সাগর বিজয়িনী



পদ্মশ্রী আরতি সাহা (গুপ্ত)

আরতি সাহা। নামটি কারোরই অজানা নয়। প্রথমে বাঙলায়, পরে ভারতে, এখন সারা এশিয়ার সাঁতারে অদ্বিতীয়া আরতি সাহা। শুধু এশিয়ায় কেন? আরতির সাঁতারের সুনাম সাগর-পারেও সুবিস্তৃত। ঘরকুনো বাঙালীর বীর মেয়ে আরতি। ভয়াবহ এবং দুর-ধিগম্য ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আরতি আমাদের গর্বের পাত্রী। তাই বাঙলার ঘরে-ঘরে আজ দুরন্ত মেয়ের দুর্জয় অভিযানের জয়গান।

ঐকান্তিক আগ্রহ, অটুট মনোবল এবং দুর্জয় সঙ্কল্প থাকলে একটি সাধারণ ঘরের বাঙালী মেয়ের পক্ষে খেলাধূলার ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য, কতটা প্রতিষ্ঠা এবং কি পরিমাণ সম্মান লাভ করা সম্ভব, আরতি সাহা (গুপ্ত) তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, খেলাধূলায় যারা পটু, বিশ্ব অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তাদের খেলোয়াড়-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে আরতি সাহা সে সম্মান তো পেয়েছেনই, তারপর দুরন্ত ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল জয় করে তিনি পেয়েছেন বীর নারীর দুর্লভ সম্মান, যে সম্মান আজ পর্যন্ত এশিয়ার অন্য কোন মেয়ে লাভ করতে পারেননি।

সুনামের সোপান বেয়ে আরতি সম্মানের মিনারে আরোহণ করেছেন। তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সাঁতারকে খেলাধূলার প্রিয় বিষয় হিসাবে বেছে নিলেও লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এবং অসি চালনাতেও হাত ভাল ছিল। হাটখোলা ব্যায়াম সমিতির অঙ্গন ছিল তাঁর প্রথম জীবনের উপবন।

সাইকেল চালনায় পটু আরতি ছোটবেলা থেকে। পরে মোটর চালাতে শিখেছেন প্রয়োজনের তাগিদে। অভিনয়ে সুনাম আছে। 'কৃষ্ণ সুদামায়' একাধিকবার দেখেছি সুদামার ভূমিকায় সুঅভিনয় করতে। সঙ্গীতেও দখল কম নয়। অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন থেকে আহরিত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও খেয়ালের কৃতিত্ব নিদর্শন পত্রও রয়েছে এই খেয়ালী মেয়ের ঘরে সাজানো।

আর সংসারের কাজেও অসাধারণ। মাতৃহারা আরতি ছিল পিতার সংসারের কর্ত্রী, বৃদ্ধা পিতামহীর অন্ধের যষ্টি, ছোটবোন ভারতীর অভিভাবিকা। এদের দেখাশুনো এবং সংসারের যাবতীয় কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই করতে হয়েছে লেখাপড়া। ইংলিশ চ্যানেল-অভিযানে যাবার সময় আরতি সাহা ছিলেন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

গঙ্গার কোলে লালিতা পালিতা আরতির সাঁতার শুরু গঙ্গাতেই। শোভাবাজার অঞ্চলের ১৪।৪, বলরাম মজুমদার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে কাকা বিশ্বনাথ সাহা মা-মরা ভাইঝি আরতিকে নিয়ে রোজ গঙ্গায় নাইতে যেতেন আর একটু একটু করে সাঁতার শেখাতেন। মেয়েটির হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গি দেখে ওঁর উপর নজর পড়ে হাটখোলা ক্লাবের অন্যতম পরিচালক সাঁতার-পাগল বিজিতেন বসুর। বিজিতেন বাবুই আরতির বাবা পাঁচুগোপাল সাহার অনুমতি নিয়ে আরতিকে এনে ভরতি করেন হাটখোলা ক্লাবে। পরে আরতিকে সাঁতারে সুপটু করে তোলেন বিখ্যাত সাঁতারু শচীন নাগ ও লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারু দলের অধিনায়ক যামিনী দাস।

বিজিতেন বাবুর জন্য দুঃখ হয়। তিনি আর ইহজগতে নেই। বিজিতেন বসু সত্যিই ছিলেন সাঁতার-পাগল। বিদ্যা, ধর্ম, হৃদি, মর্ম সবই ছিল তাঁর সাঁতার। ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা ছিল প্রাণের প্রিয়। প্রিয় ছাত্রী আরতি চ্যানেল জয়ের গৌরব অর্জনের আগেই বিজিতেন বসু ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একমাত্র এক শ' মিটার ফ্রি স্টাইল ছাড়া মেয়েদের সাঁতারের সমস্ত বিষয়েই আরতি ছিলেন রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী। এই কৃতিত্বই তাঁকে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এনে দেয়। তারপর আরতি ও ভারতী—দুই বোন চার হাত দিয়ে সাঁতারের রাশি রাশি পুরস্কার ঘরে তোলেন।

১৯৫৯ সালে আরতি সাহা যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁর গৌরবের দিন অস্তমিত। কিছুকাল আগে থেকেই তিনি সাঁতার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবু মিহির সেন ও ব্রজেন দাসের চ্যানেল অতিক্রমের খবর তাঁর মনে সাফল্যের অনুপ্রেরণা এনে দেয়। বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে, বহু চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে অরুণ গুপ্তকে ম্যানেজার হিসাবে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করেন অজানার উদ্দেশ্যে।

উত্তরে ইংলণ্ড, দক্ষিণে ফ্রান্স, মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত দুস্তর পারাবার ইংলিশ চ্যানেল। দুরন্ত, দুরতিক্রম্য ও দুরধিগম্য ইংলিশ চ্যানেল—কুড়ি-একুশ মাইল যার প্রস্থ—জল যার হিমশীতল—যার জঠর নানা জানা-অজানা সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল, সেই ইংলিশ চ্যানেল। জল শুধু হিম-শীতলই নয়, খল জল ছল-ভরা—ইংলিশ চ্যানেল। একটু বাতাস হলেই যার উত্তাল উদ্দাম ভয়ঙ্কর রূপ। আবহাওয়া অস্থির হলে তো কথাই নেই। তখন ইংলিশ চ্যানেল লক্ষ ফণা তুলে গর্জন আরম্ভ করে, আপনার রুদ্র-নৃত্যে লক্ষ হাতে করতালি বাজায়।

তা ছাড়া ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংলণ্ডের ডোভার উপকূল পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে চ্যানেলের প্রস্থ কুড়ি-একুশ মাইলের মত হলেও প্রবল স্রোতের টানে এঁকেবেঁকে সাঁতার কেটে কেটে চ্যানেল পার হতে হলে প্রায় দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়। শুধু প্রবল স্রোতের টান আর পথের দূরত্বই সাফল্যের পথের প্রধান অন্তরায় নয়। বহু রকমের বিপদের আশঙ্কা আর বাধাবিপত্তির আকর হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল দরিয়া। বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন লোনা জল চোখে ঢোকার, আর 'জেলী' ফিশের হুল এবং 'গ্রানাইটের' আলিঙ্গনের আশঙ্কাও নিরন্তর। সাঁতার কেটে এ হেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অনেকরই জীবন লীলা শেষ হয়ে যেতে পারে।

চ্যানেলের স্রোতের টান আবার দ্বিমুখী। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'ফ্লাড' ও 'এব' টাইড। একটি স্রোত আসে উত্তর দিকের নর্থ পোল থেকে। এর নাম 'ল্যাব্রাডর' কারেণ্ট। আর একটি স্রোত দক্ষিণের গাল্ফ্ অব মেক্সিকো থেকে, যাকে বলা হয় 'গাল্ফ্ স্ট্রীম'। ল্যাব্রাডর কারেণ্টের জল খুব ঠাণ্ডা; এত ঠাণ্ডা যে হিম-শীতল বলা যায়। গাল্ফ্ স্ট্রীমের জল ঈষতুষ্ণ। তবু অসহনীয়। দুই জলেই হাড় কাপানো শীত। দু'দিক থেকে প্রবাহিত দু'রকমের স্রোতের টানা পোড়েন এবং এত প্রতিকূলতার মধ্যে তিরিশ চল্লিশ মাইল সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা তাদের পক্ষেই সম্ভব, জীবন-মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য মনে করে, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবারকে জ্ঞান করে তুচ্ছ—যাদের মনে আছে অসাধ্য সাধনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অজানাকে জানবার অনিবার্য আগ্রহ।

শুধু সাঁতার কেটে কেন? বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম যে পাইলট

হাওয়াই পথে ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন, তিনিও অমর হয়ে আছেন। ডোভার বন্দরের উপর চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম সাঁতারু ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মরমূর্তির অদূরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর মর্মরমূর্তি।

দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন ১৮৭৫ সালে। দ্বিতীয় সাঁতারুর চ্যানেল অতিক্রম করতে ৩৬ বছর পার হয়ে যায়। আরও ১১ বছর পরে তৃতীয় সাঁতারু চ্যানেল পাড়ি দেন। তারপর অনেকেই চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন, আবার চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত অনেকে জীবনভোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। তাই বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও ভয়াবহ ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব ও কৃতিত্ব আজও অসাধ্য সাধনের পর্য্যায়ভুক্ত।

জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ভয়াল সুন্দর রূপের মধ্যে আরতি যেভাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তার তুলনা কম। দৈব দুর্যোগ ও পথ প্রদর্শকের ভুল নিশানায় তাঁর প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়।

২৬শে আগস্টের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ। লাইফ বোট দেরিতে আসায় এই অবস্থার মধ্যেই আর সবার সাঁতার আরম্ভ হবার ৪০ মিনিট পরে আরতি জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। চমৎকার ভাবে সাঁতার কাটছিলেন। আগের বারের বিজয়িনী আমেরিকার গ্রেটা এণ্ডারসনকেও ধরে ফেলেছিলেন।

সম্মুখে রঙীন আশার হাতছানি। ডোভারের উপকূল বেশী দূরে নয়। আর মাত্র পাঁচ মাইল। কিন্তু পশ্চাতে উন্মত্ত জলরাশির অবিরত আকর্ষন। বিপরীত স্রোতের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা করে আরতি যখন আর দু'মাইলের বেশি এগোতে পারলেন না তখন তাঁকে এক রকম জোর করেই লাইফ বোটে টেনে তোলা হল।

চ্যানেলের বুকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বঙ্গ ললনা আরতি। তাঁর

এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা, এত আশা, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কিভাবে দেশে ফিরে যাবেন—কেমন করে দেশবাসির কাছে মুখ দেখাবেন, এই চিন্তায় অস্থির।

একে একে মনের উপর অতীত স্মৃতি ভেসে আসে!···দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে অনুশীলন—তাঁর সাফল্য সম্পর্কে হাজার লোকের উচ্চাশা—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি—কত কষ্টে অর্থ সংগ্রহ—কত বাধা বিপত্তি!

অর্থ সাহায্যের জন্য ডাঃ রায়ের কাছে যেতেই ডাঃ রায় বলেছিলেন—'তুই পারবি না'। আরতি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 'পারব, আমি নিশ্চয়ই পারব, কথা দিচ্ছি আমি ইংলিশ চ্যানেল পার হব'। সেই প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

এক একটি দিন যায় আর চিন্তা বাড়ে। দ্বিতীয়বার সাঁতার আরম্ভের সুযোগ আসে না। প্রতিনিয়ত সমুদ্রের গর্জন তাঁকে ভ্রুকুটি করে যায়। আরতি একমনে ভগবানকে ডাকেন আর রোজ যান ডোভার বন্দরে ম্যাথু ওয়েবের মর্মর মূর্তির পাশে। ওয়েবের আত্মার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। সাগর বিজয়িনী হবার উন্মত আশায় আরতি তখন বেপরোয়া। নতজানু হয়ে দেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার মত রোজ তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন প্রথম ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মর মূর্তির পদমূলে।

পাষাণ মূর্তি ভেদ করেই হয়তো তাঁর ডাক পৌঁছয় ভগবানের কাছে। ১৯৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করে 'মঙ্গলে উঠে বুধে পা' দেবার মত ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে তিনি আবার চ্যানেলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে। প্রথম দিকে সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। কিন্তু একটু প:রই সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। মরণ যুদ্ধের জন্য আরতিও মরিয়া হয়ে উঠলেন। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অনমনীয়

দৃঢ়তার সঙ্গে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলেন তিনি। সম্মুখে পাইলট বোটে উড্ডীয়মান ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা তাঁর মনে এনে দিল দুর্জয়কে জয় করবার অসীম শক্তি। ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি চ্যানেল জয় করলেন। হলেন সাগর বিজয়িনী। প্রথমবারের ব্যার্থতায় যিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠল প্রশান্ত আনন্দের হাসি।

তারপর ডোভারের 'অ্যান হ্যাথওয়ে' হোটেলের ৬ নং ঘর অভিনন্দন-বার্তায় ভরে উঠল। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী নেহরু, কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের প্রায় শ' দেড়েক টেলিগ্রাম ঐ ঘরে দু'দিনে বিলি করলো ডোভারের পোস্টম্যান। ইণ্ডিয়া হাউসে সম্বর্ধনা জানালেন ভারতীয় হাই কমিশনার বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। লণ্ডনে আরও বহু সম্বর্ধনার আয়োজন হল। দেশে ফেরবার পর সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনায় হাঁপিয়ে উঠলেন আরতি সাহা আর তাঁর ম্যানেজার অরুণ গুপ্ত। কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে জয়ের মালার সঙ্গে এল নানা পুরস্কার। রুপোর থালা, সোনার হার, কলম, ঘড়ি, অর্থ, অভিনন্দন পত্র ও নানা পুরস্কারে ঘর ভরে গেল। ভারত সরকার তাঁকে দান করলেন 'পদ্মশ্রী' খেতাব।

১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে যে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হল সেই 'মান-পত্রে' লেখা হল ঃ

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী ভারতের গৌরব-মণি

শ্রীমতী আরতি সাহাকে

কলিকাতা মহানগরীর পৌর সম্বর্ধনা

বিশ্বের দুর্জয় গৌরব তুমি জননীর পদতলে নিবেদন করিয়াছ, জন্মভূমি আজ তোমার গৌরবে উজ্জ্বলা হইয়াছেন। তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।



প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আরতি সাহা, হাতে 'পদ্মশ্রী' উপাধির সনদ

হে নারী বীরাঙ্গনা !

আরতি তুমি সাগর বিজয়িনী হইয়াছ। যে সমুদ্র বিশ্বের বহু যশস্বী সাঁতারুর দুঃসাহস চূর্ণ করিয়াছে—তুমি নারী, তুমি তরুণী সেই তরঙ্গক্ষুব্ধ, হিম-শীতল সমুদ্রের বারিরাশি ভেদ করিয়া তোমার দুঃসাহসিক অভিযানের চরম পরিচয় দিয়াছ। প্রাচ্যের কোন নারী সাফল্যের এই তটভূমি স্পর্শ করে নাই—প্রাচ্য নারীর গর্বিত পদতলে পশ্চিমের সমুদ্র আর কোনদিন এমন ভাবে অবলুণ্ঠিত হয় নাই ! প্রাচ্য ভূমিতে তাই তুমি অনন্যা।

আরতি, তুমি আজ মাতৃ মন্দিরে পূজার প্রধান আরতি-দীপ। তোমার সাহসের শিখা আজ মাতৃ বন্দনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাকে আমরা সস্নেহে বরণ করিয়া লইতেছি। তুমি আজ যেখানে দাঁড়াইয়া নগরীর লক্ষ হৃদয়ের সম্বর্ধনা লইতেছ—সে আনন্দ-সম্বর্ধনা শুধু এই গৃহে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা সমগ্র ভারতললনার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, তুমি তাহাদের সাগ্রহ মাতৃচুম্বন গ্রহণ করিয়াছ। কারণ, তুমি তাহাদের বহু অপমানের অশ্রু সমুদ্রের জলে মুছিয়া দিয়াছ। তুমি আর মাতৃহীনা নও, ভারতবর্ষের নারী হৃদয়ের তুমি মানস কন্যা।

অয়ি অনন্যা-শক্তিধারিণী !

যে মুহূর্তে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলে,—একবার অন্তরে ভাবিয়া দেখ সেই মুহূর্তে ছিল কি তোমার সম্মুখে শুধুই সমুদ্রের ভয়াল গর্জন, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আর মহাসঙ্কটের ভ্রূকুটি ? ছিল না কি সেদিন তোমার সম্মুখে একটি অশ্রুসিক্ত সস্নেহ কমল-আনন ? সে তোমার, সে আমার মা, সে যে ভারত জননীর বহুদিনের, বহু অতীতের বীরাঙ্গনা কন্যাদের সম্মিলিত মুখচ্ছবি। অতীতের অন্ধকার হইতে—দেখ নাই কি তুমি—বীরাঙ্গনা ভারত-নারীদের ব্যাকুল অশ্রুমাখা মুখ তোমার সম্মুখের পথ নির্দেশ করিতেছে ?

ইতিহাসের অতল তলদেশে তাঁহারা নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন, তুমি সাগরবিজয়িনী, তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ। যাঁহাদের চিত্র তুমি এখানে আজ তোমার চারিপার্শ্বে দেখিতেছ, লও, তুমি সেই ভাস্বরমূর্তি, বীরশ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানদের অলক্ষ্য পুলকিত হৃদয়ের আশীর্বাদ। আমাদের বিশ্বাস রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও মহানায়ক সুভাসচন্দ্র আজ এখানে সমবেত! তাঁহাদের প্রসারিত হস্ত নির্দেশ দিতেছে নব নব বিজয়ের, নূতন গৌরবের এবং ভারত নারীর অনর্জিত অসামান্য সাফল্যের দিকে। তুমি ইহা অন্তরে উপলব্ধি কর।

হে বীর বালা!

নারী অবলা, নারী শক্তিহীনা—এই অপবাদ কোন এক অশুভ মুহূর্তে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল জানি না। এই অপবাদকে তুমি তোমার আন্তর শক্তির প্রভাবে দূরে সরাইয়া দিয়াছ। ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্যায়ে ইহার সাক্ষ্য মিলে না, মহাভারতের পাতায় পাতায় তাকাইয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, রাজপুতনার ইতিহাসে দেখিতে পাই অসংখ্য নারীর নির্ভীকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের অমর কীর্তিগাথা স্মরণ করিতে আমরা বিস্ময়ে নির্বাক হই। তুমি তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতে নারীর মহিমাকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে। তোমাকে বারম্বার জানাই আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের আনন্দ সম্প্রীতি।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘায়ু হও!

জয়হিন্দ!

কলিকাতা নাগরিকগণের ও

১৬ই মার্চ, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে—

১৯৬০ **শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মেয়র**

জীবনের ইপ্সিত বাসনা পূরণে যিনি সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন ১৯৬০ সালের পয়লা মার্চ তাঁর সেই দুর্জয় অভিযানের দোসর অরুণ গুপ্তর সঙ্গে আরতি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অরুণ গুপ্তর পিতামহের নামাঙ্কিত রাস্তা দর্জিপাড়ার অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট সংলগ্ন ১৬।১, তারক চ্যাটার্জি স্ট্রীটে আরতি গুপ্তর এখন শান্তির সংসার। সংসারের বাইরে সাউথ ইস্টার্ন রেলের লেডি ওয়েলফেয়ার ইন্‌সপেক্টর। জলের বুকে আরতি বন্যতার দুরন্ত ঘূর্ণি, কিন্তু সংসারের কোলে চিরদিনই কমনীয়তার প্রতিমূর্তি, নারীত্বের মর্মছোঁয়া আবেদন।

ইংলণ্ডবাসী তাদের অন্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম দুঃসাহসী বীর ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মর মূর্তি ডোভার বন্দরে প্রতিষ্ঠা করেছে। চ্যালেন বিজয়িনী আমাদের দুঃসাহসী মেয়ে আরতির মর্মর মূর্তি আমরা প্রতিষ্ঠা করিনি। তাঁর মূর্তি আমাদের দেশের ক্রীড়ানুরাগীদের মনের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

হারানো সুর



লীলা ব্যানার্জী

যে সব বাঙালী মহিলা বিশ কি পনের বছর আগে খেলার জগৎ আলো করেছেন, আজ তাঁদেব সবাইকে চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হয়। সে যুগের যিনি নিজে থেকে এসে এ যুগে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা অধিকার করেছেন তিনি সাঁতার-পটিয়সী লীলা দেবী।

লীলা দেবী বলছি, কারণ বর্তমানের বিবাহিত জীবনে যিনি বন্দ্যোপাধ্যায়, সে যুগে তিনি ছিলেন চট্টোপাধ্যায়।

ভুলেই গিয়েছিল সবাই লীলা চ্যাটার্জিকে, যাঁকে নিয়ে একদিন সজনী দাস কবিতা লিখেছিলেন; অন্তত মনের উপরের স্তরে কোন ঠাঁই ছিল না তাঁর। হঠাৎ একদিন বিস্মৃতির আড়াল থেকে, অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করে, হাঁড়িখুন্তি নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে এলেন, বললেন, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাবো। হঠাৎ এ খেয়াল জাগলো কেন সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

আরতির অসাধারণ কৃতিত্বে আজ বাঙালী মেয়ের সম্মান ছুনিয়াময় ছড়িয়ে গেছে। যে বাঙালী মেয়েদের কোন কাজের নয়, শুধু কাঁদতে জানে বলে দূর ছাই করেছে ঘরে বাইরে সবাই। আরতি প্রমাণ করেছে বাঙালী মেয়ের অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা। তবু আমাদের বদনাম যায়নি। ওরা বলছে, বয়েসকালে যদি বা

কিছু প্রাণশক্তি কারো থাকে, বাঙালী ঘরের ঘরকন্না আর ছেলে-মেয়ের হেফাজতে কেউটেও কেঁচো মেরে যায়। আমি ঘরকন্না করছি ষোল বছর; সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থবধূর জীবন, যেখানে শুধু রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা, সারাজীবন এক চাকাতেই বাঁধা, সেখানে তিনটি সন্তানকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে বড় করে তুলতে হয়েছে। তা বলে আমার সেই মনের সাহস, অন্তরের অ্যাডভেঞ্চাবের স্পৃহা—কই, তা তো মরেনি। অনুজপ্রতিম ডাঃ বিমল চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ৩৭ বছর বয়সের কোন জননী বা গৃহিণী ইংলিশ চ্যানেল সাঁতবাবার প্রয়াস করেছে, এমন খবর তার জানা নেই। অতএব ··

ক'দিন বাদেই লীলা দেবী একটানা আট ঘণ্টা সাঁতার কেটে প্রমাণ করে দিলেন, দক্ষতা অটুট। চারিদিক থেকে সাহায্য ও উৎসাহ আসতে লাগলো। তৈবী হল পাসপোর্ট, ভিসা। ডাঃ বিমল চন্দ্র ছুটি নিয়ে তৈরী, সঙ্গে যাবেন ম্যানেজার হয়ে। ডোভারে ঘর ভাড়া হয়ে গেল, হয়ে গেল প্লেনে প্যাসেজ বুক করা। নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত অনুশীলনও চলেছে। ভারত সরকার থেকে বিদেশী মুদ্রার অনুমোদন এলেই যাত্রা।

অনেক কাঠখড় পোড়ানো সত্ত্বেও সে অনুমোদন গত বছর মেলেনি। এবারের জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল। বহু পার্লামেণ্ট সদস্য, মন্ত্রী, বিধানসভা সদস্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, জানিয়ে-ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রাজ্য পাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিয়েছিল, যাত্রা করা দরকার তাও তাদের জানতে বাকী ছিল না। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের 'সীজন' হু হু করে ছুটে গেল সমাপ্তির দিকে। এবারও অনুমতি মিলল না। এবারও সরকারী ঔদাসীন্য ব্যর্থ করে দিল এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা! তবু আশায় বুক বেঁধে আছেন লীলা ব্যানার্জি আগামী বারের জন্য।

যদি ব্যর্থ হয়ই, তাহলেও কিন্তু লীলা চ্যাটার্জি মুছে যাবার নয়। সেই সুদূর ১৯৩৩ সালে ২৪-পরগনা জেলার বারুইপুর থেকে সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আট ও দশ বছর বয়সের দুটি মেয়েকে এনে বিজ্ঞানসম্মত সাঁতার শিখবার জন্য পৌঁছে দিয়েছিলেন সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে, সাঁতারের গুরুর গুরু শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় পালের কাছে। ছোট বোন লীলা, বড় বোন রাণী। প্রতিদিন দু' বোন বারুইপুর থেকে হেদোয় আসে, আর শান্তিদার কঠোর শাসনে প্রাণপণ অনুশীলন করে! এর পর শান্তিদা লীলাকে নিজের বাড়িতে এনে মেয়ের মত পালন করতে লাগলেন, আর তার সঙ্গে চললো সাঁতারের সাধনা।

পরম লগন এলো তিন বছর বাদে ১৯৩৬ সালের ৩রা আগস্ট, যেদিন লীলা তখনকার চ্যাম্পিয়ান বাণী ঘোষকে হারিয়ে, তার রেকর্ডও ম্লান করে দিল। আগের বছর লীলা গঙ্গাবক্ষে এক মাইল সাঁতারে বাণীকে মেরেছিল কিন্তু পুকুরের সাঁতারে এই প্রথম।

সেদিন থেকে আর লীলা চ্যাটার্জিকে বাংলা দেশে হারাতে পারেনি কেউ। তবে হারিয়েছিল পাঁচজন পুরুষ সাঁতারু; যখন দু' বছর বাদে তাঁকে গঙ্গার বুকে ত্রিশ মাইল সাঁতারে নামিয়েছিলেন শান্তিদা। হুগলী জুবিলি ব্রিজ থেকে কুমারটুলি ঘাট অবধি এই সাঁতারে সারা ভারতের জন ত্রিশেক প্রতিযোগীর মধ্যে নারী মাত্র এই তের বছরের মেয়েটি। চন্দননগরের পরে প্রবল ঝড় উঠলো। গঙ্গার বুক উদ্দাম, নৌকাগুলো প্রতিযোগীদের থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছে। অর্ধেকের বেশী সাঁতারুকে উঠে পড়তে হল। শেষ সীমায় পৌছলো মাত্র বারজন, তার মধ্যে লীলা চ্যাটার্জি ষষ্ঠ, লীলার সময় লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা চৌত্রিশ মিনিট। অথচ প্রথম দিন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে এসে শুশুকের ডিগবাজি দেখে ভয়ে নৌকোয় উঠে পড়েছিল লীলা।

এর পর লীলাদের সংসারে বিপর্যয় এলো সৌরেনবাবুর মৃত্যুতে

এবং কিছুদিন বাদেই লীলাকে বিয়ে দেওয়া হল। সাঁতারের পর্বে ছেদ পড়লো।

১৯৪৪ সালে বোম্বাইয়ের একদল সাঁতারু এল কলকাতায়, বাঙলার সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। সে দলে ছিল ঝানু সাঁতারু বৃটিশ মেয়ে প্যাম ব্যালেণ্টাইন। ব্যালেণ্টাইনের বিরুদ্ধে টক্কর দিয়ে চলতে পারে এমন মেয়ে কই বাঙলায়? লীলা তখন প্রথমজাত পুত্রের বিয়োগে বিহ্বল। তবু ডাক পেয়ে এল বাঙলার মুখ রক্ষা করতে। ব্যালেণ্টাইনকে হারাতে পারেনি, তবে এমন তাড়া করেছিল, ব্যালেণ্টাইন তা ভোলেনি কোনদিন। সেবারই লাহোর জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে ব্যালেণ্টাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান পান লীলা ব্যানার্জি। ব্যালেণ্টাইন অপরাজিত গৌরব নিয়েই ভারত ছাড়ে, আর লীলা ব্যানার্জির সাঁতার-জীবনেও এইখানে যবনিকা পড়ে; তিনি পাকাপাকিভাবে অবসর গ্রহণ করেন। ডাইভিং-এ তাঁর পারদর্শিতার কথা পুরানো খবরের কাগজে নথিবদ্ধ হয়ে আছে। একাধিকবার ৩০ ফুট বোর্ড থেকে ডাইভিং প্রদর্শনী দিয়েছেন তিনি।

শুধু জলে নয়, সাইকেল চালানোয়, দস্যিপনা করাতে, নাচে, গানে, অ্যাথেলেটিকসে লীলা চ্যাটার্জি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই জয়লাভ করেছেন। বিষ্ণু ঘোষের আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করেছেন, আবার গভীর নিষ্ঠায় সেতার শিক্ষা করেছেন গুরু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। সেতার শুনে মুগ্ধ হয়ে সে যুগের বেতার কর্তা নৃপেন মজুমদার ওঁকে বেতারে বাজাতে ডেকেছিলেন, কিন্তু সেদিকে 'উৎসাহী' অভিভাবকের অভাব ছিল বলে শেষ পর্যন্ত বেতারে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

মুখে কথাটি নেই, সেকালেও ছিল না, আজও নেই। সাঁতার শিখতে শান্তিদার বকুনি ও চড়চাপড়, তাও চুপ করে সহ্য করেছে। কিন্তু দস্যিপনাও কম ছিল না। বালিগঞ্জে জ্যাঠার বাড়িতে রয়েছে

কিশোরী লীলা। এক ভদ্রলোক এলেন সেখানে মোটর সাইকেলে চড়ে। এমনভাবে মোটর সাইকেলটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো লীলা যে ভদ্রলোক সাগ্রহে ওকে চালানোর মূল নীতি শিখিয়ে দিয়ে মোটর সাইকেলটি রেখে ভিতরে যাবার সময় সাবধান করে দিয়ে গেলেন, 'খবরদার খুকি, হাত দিও না। বরং আমি তোমাকে চড়িয়ে আনবো।'

গেল, গেল, সোর উঠলো চারদিকে। একটা কিশোরী মেয়েকে নিয়ে একটা গর্জমান মোটর সাইকেল ছুটে গিয়ে পৌঁছলো বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা পুকুরে! আরোহিণী সাইকেল ছেড়ে জলে ভেসে উঠে সাঁতার কাটতে লাগলো। মোটর সাইকেল রইল ডুবে। লীলা ভাবছিল সেও যদি ডুবে থাকতে পারতো, ধরা পড়তে হত না তবে। ধরা পড়ে ভালই হল। মোটর সাইকেলটার সন্ধান পাওয়া গেল।

আরো আগের কথা। লীলা তখন শান্তিদার বাড়ি থাকে। সন্ধ্যার পর শান্তিদা ওকে সঙ্গে করে ছবিঘরে নিয়ে যান, সেখানে উনি ম্যানেজার। প্রতিদিনের মত সেদিনও দারোয়ান দিয়ে রিক্শা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন লীলাকে। রাত দুপুরে নিজে ফিরে গিয়ে শোনেন, কোথায়, সে মেয়ে বাড়ি আসেনি তো! ছবিঘরে গিয়ে দরোয়ানকে তলব করে জানা গেল, সে বাড়ির দোরগোড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। সর্বনাশ! খোঁজ, খোঁজ, থানা পুলিস, এদিক ওদিক কোন হদিস নেই। শেষ পর্যন্ত ছবিঘরে দোতলার বক্স আসনে পাখার নীচে ঘুমন্ত লীলাকে আবিষ্কার করা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সবাই। লীলাও বক্স আসনে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিল। পরে কৈফিয়ত দিয়েছিল, অন্ধকারে, কড়া নেড়ে নেড়ে হয়রান, কেউ সাড়া দেয় না, ভীষণ ভয় করছিল যে।

সেই লীলার খবর বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা লীলা ব্যানার্জিরও বিশেষ স্মরণ নেই। অনেক খবরই শান্তিদার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে

হয়েছে। এখন তাঁর দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়ে। স্বামী শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার নাম-করা মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি করেন। লীলা দেবী সময় পেলেই দেব-মন্দিরে যান ভক্তি নিবেদন করতে ও পূজা দিতে।

সেদিনের সেই দস্যি মেয়ে আজ শান্ত, মাতৃত্বের পূর্ণতায় মহিমান্বিতা। সাঁতার-জীবনে পূর্ণতা লাভের আগেই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল বলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বড় একটা কিছুর জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। হারোনো সুরে আবার বাঁধতে চাইছেন জীবনের বীণার তার। সে তারে আজ বিষাদ রাগিণী। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা কি অপূর্ণ থাকবে?

খেলার রাজ্যে কৃতিত্বের অধিকারী আর কাউকে নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠিত কবি কবিতা লেখেননি। কোন খেলোয়াড়ের স্থান নেই বাঙলা সাহিত্যে। লীলা চ্যাটার্জিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন সজনী-কান্ত দাস। সেদিক দিয়ে তিনি অনন্য, স্বীকৃতিতে নয় যোগ্যতায়।

সজনীকান্ত লিখেছিলেন:

সলিল সাবলীলা কুমারী লীলা সুখে
অগাধ স্রোতে দাও সাঁতার,
পিছনে পড়ে আছি বাঁধের বাঁধমুখে
মোদের চারদিকে ভীম পাথার।
রাষ্ট্রে সমাজে কি শরীরচর্চায়
ধরার খেলাঘরে আমরা দীন
দেখ তো পার যদি, তোমার সাধনায়
কালিমা ঘুচে মা'র একটি দিন!
সকল পরাজয়ে একটি দিকে যদি
বিজয়ী হয়ে পারি তুলিতে শির,
গাহিব তব নাম আমরা নিরবধি,
কুমারী লীলা হও সাঁতারে ধীর।

সোনার খনির সোনার মেয়ে


উষা আয়েঙ্গার

ভারতের টেব্‌ল টেনিসে দুই উষা। একজন উষা আয়েঙ্গার, আর একজন উষা সুন্দররাজ। অনেকটা ক্রিকেটের মত। ক্রিকেটে তিন বিজয়—বিজয় মার্চেণ্ট, বিজয় হাজারে ও বিজয় মঞ্জরেকার। তবে ক্রিকেটে দুই বিজয়ের অস্তমিত প্রতিভার কোলে আর এক বিজয়ের উত্থান। মেয়েদের টেব্‌ল টেনিসে দুই উষার একসঙ্গে আলোক দান।

এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত দু'জনই মহীশূরের মেয়ে। তবে উষা আয়েঙ্গারের কাছে মহীশূর প্রায় মরুতীর্থের মত। কালেভদ্রে ওখানে যাওয়া ঘটে। বাঙলাই তার একরকম ঘরবাড়ি। জন্ম অবশ্য কোলার গোল্ড ফিল্ডে। কিন্তু জন্মের পর থেকে বাঙলাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস। আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে, কথাবার্তায় প্রায় বাঙালী। মুখে পরিষ্কার বাঙলা ভাষা। কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিষ্টি সুর। স্বভাবে বাঙালীর নম্রতা, বাঙালীর লজ্জা। 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' মহীশূরের মূর্তিমতী মেয়ে উষা এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিতা বাঙালী মেয়ে। উষা আয়েঙ্গারকে বাঙালী বলতে আমার কুণ্ঠা নেই। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসেও বাঙলার মেয়ে হিসাবে তার পরিচিতি।

বাঙলার টেব্‌ল টেনিস ক্ষেত্রে উষা আয়েঙ্গারের আবির্ভাব 'উষার

উদয়-সম অনবষ্টিগুতা'। সঙ্কোচের গুণ্ঠন খুলে কম্পিটিশনে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-প্রকাশ। ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ।

১৯৫৫ সাল থেকেই বাঙলার পুরোভাগে তার আসন। সে আসন থেকে কেউ তাকে নামাতে পারেনি। একটানা ছ' বছর বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। সত্যিই বিস্ময়কর বিজয়-বৈজয়ন্তী। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসে র‍্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায়ে এই কিশোরী মেয়ের স্থান এখন তৃতীয়। প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী মীনা পরাঞ্জে, দ্বিতীয় স্থানে উষার দোসর দ্বিতীয় উষা, যার পুরো নাম উষা সুন্দররাজ। এটা ১৯৬১ সালের র‍্যাঙ্কিংয়ের কথা।

দুই উষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে ছোট আর কে বড়, তার কিন্তু মীমাংসা হয়নি এবং সে ঘটনা বাঙলার টেব্‌ল টেনিসের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবেই নথিভুক্ত হয়ে আছে। টাইম লিমিটের খেলায় কেউ কাকে হারাতে পারেনি। অবশ্য জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে সুন্দর-রাজকে একবার হার স্বীকার করতে হয়েছে আয়েঙ্গারের কাছে।

১৯৫৪ সালে উষা আয়েঙ্গার যখন 'ডায়োসেশান'-এর ক্লাস সেভেনের ছাত্রী, তখন ওয়াই এম সি এর কলেজ ব্রাঞ্চের চ্যাম্পিয়ন-শিপে তার প্রথম অংশ গ্রহণ এবং একে একে তপতী মিত্র, আর ফার্নাণ্ডেজ ও ইস্থার মোজেসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। তপতী তখন টেব্‌ল টেনিসের নাম-করা মেয়ে, ফার্নাণ্ডেজের নাম আরও বেশী, আর ইহুদী মেয়ে ইস্থার মোজেস তখনকার 'রেনিং চ্যাম্পিয়ন'। ১১ বছরের ছোট্ট মেয়ে উষার পক্ষে প্রথম অভিযানে এদের একে একে পরাভূত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ, কম কথা নয়।

এর পর ইডেন গার্ডেনে ইস্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উষার কাছে ইস্থার মোজেসের আবার পরাজয় এবং উষার আবার চ্যাম্পিয়নশিপ। শুধু সিঙ্গলসেই নয়, মিক্সড ডাবলসেও। বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিস্ ও ভ্যাকলাব টেরেবা

এসেছিলেন এ বছর ভারত সফরে। ইস্ট ইণ্ডিয়ায় খেলতে এসে আন্দ্রিয়াদিস উষাকেই মিক্সড ডাবলসের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন। ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল টেরেবা ও তপতীর সঙ্গে। বলা বাহুল্য, আন্দ্রিয়াদিস ও আয়েঙ্গার পেলেন বিজয়ীর পুরস্কার। উষার মাথায় দ্বি-মুকুট।

খেলার পর পুরস্কার বিতরণের পালা। টুর্নামেণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান পঙ্কজ গুপ্ত সভাপতি। পুরস্কার বিতরণের জন্য ফুটফুটে ফর্সা মেয়ে উষার ডাক পড়ল। সলাজ হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল উষা নিজের প্রাপ্য দুটি পুরস্কার স্মিতহাস্যে কোলে রাখবার সময় ইনডোর স্টেডিয়ামে আনন্দের হাসি বয়ে গেল। এর পর র‍্যাঙ্কিং-এ উষা পেল প্রথমস্থান। টেব্‌ল টেনিসে বাঙলার এক নম্বর মেয়ে। সেই থেকে আজ অবধি বাঙলা টেব্‌ল টেনিসের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। উপর্যুপরি ছ'বার চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দু'বছর ফাইন্যালে হারলেন মিসেস চমন কাপুর, পরের বছর তপতী মিত্র, শেষ তিন বছর বিজয়িনী শকুন্তলা দত্তর বিরুদ্ধে।

জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে উষার বাঙলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ১৯৫৬ সাল থেকে। রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় চেকোস্লোভোকিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিস ও ভারত-খ্যাত ভি শিবরামনের কোচিং-এ ইতিমধ্যে উষার হাত খুলে গেছে। তার তূণে এখন নানা অস্ত্র। তবুও ১৯৫৬ সালে শাহারানপুরে জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিডিং-এ স্থান হল না। কিন্তু আন্‌সিডেড খেলোয়াড় হিসাবেই উষা হারালো সিডিং-এর উঁচু স্থানের মেয়েদের।

ভারতের তখনকার পাঁচ নম্বর মেয়ে প্রিস্‌কা নানসের সঙ্গে উষার প্রি-কোয়ার্টার ফাইন্যাল। কিন্তু নানস উষাকে আমল দিতে চান না। তাঁর চিন্তা পরের রাউণ্ড নিয়ে, যেখানে তাঁকে খেলতে হবে তখনকার তিন নম্বর মেয়ে উষা সুন্দররাজের সঙ্গে। কিন্তু খেলতে হল না। উল্টে উষা আয়েঙ্গারই খেলল উষা সুন্দররাজের সঙ্গে

প্রি-কোয়ার্টারে প্রিসকাকে হারিয়ে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে সুন্দররাজও ঠাঁই পেলেন না। সেমি-ফাইন্যালে উষার হার হল মীনা পরাঞ্জের কাছে। শেষ পর্যন্ত মীনা পরাঞ্জেই পেলেন চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৫৭ সালে কলম্বোতে জাতীয় টেব্‌ল টেনিসের আসরেও এক অবস্থা। এখানেও সেমি-ফাইন্যালে রাসেল জনের কাছে উষার পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত রাসেল জনের চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৬০ সালে হায়দরাবাদে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এখানেও সেমি-ফাইন্যালে মীনা পরাঞ্জের কাছে পরাজয় এবং মীনা পরাঞ্জের চ্যাম্পিয়নশিপ। এইভাবে তিন, তিনবার জাতীয় টেব্‌ল টেনিসের সেমি-ফাইন্যাল থেকে উষাকে পিছু হটতে হয়েছে।

এশিয়ান টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিশনশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য দু'বার ডাক এসেছে উষার কাছে। প্রথম ১৯৫৭ সালে। কিন্তু অল্প বয়স বলে ম্যানিলায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে বোম্বেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ঘটেছে।

খেলোয়াড় হিসাবে উষা প্রধানত ডিফেন্সিভ প্লেয়ার। তাই বলে কি হাতে মার নেই? আছে এবং ভাল মারই আছে। অমন দীর্ঘ তনু যার, তারই তো মারার সুযোগ। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মারমুখী খেলা খেলতে কেন যে উষার অনীহা, তা অনেকেরই অজ্ঞাত। অতুলনীয় চপ-ডিফেন্স আর অনমনীয় মনোবলই উষার খেলার প্রধান সম্পদ। খেলার সময় চিরদিনই অচঞ্চল। তার সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্তি দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক। সে মূর্তিতে দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতার সুস্পষ্ট জ্যোতি কিন্তু মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। জয়লাভে উদাসীন, পরাজয়ে অমলিন সে মুখ। যেন কিছুই হয়নি। হারজিতকে একইভাবে গ্রহণ করতে দেখেছি বাঙলার টেব্‌ল টেনিস সম্রাজ্ঞীকে।

প্রধানত ভি শিবরামন এবং আইভান আন্দ্রিয়াদিসের কোচিং-এ

উষা আয়েঙ্গার টেব্‌ল টেনিসের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিতা। টেব্‌ল টেনিসের গুরুর গুরু কিন্তু এক অখ্যাত ব্যক্তি। ওয়াকিবহাল মহলেও যার নাম আজও অজানা।

শিক্ষার স্থান কস্‌মোপলিটান ক্লাব। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে উষাদের আগের ভাড়াবাড়ির পাশেই কস্‌মোপলিটান ক্লাব। সেখানকার টেনিসের 'বলবয়' নিরুয়ার কাছেই হাতেখড়ি। বাসের মধ্যে একদিন উষার প্রশংসায় কয়েকটি ছেলেকে পঞ্চমুখ হতে দেখে নিরুয়া আত্মপ্রচারের লোভ সংবরণ করতে পারছিল না। আবেগে বলে ফেলেছিল—'ওকে তো আমিই প্রথম খেলা শিখিয়েছি।' ছেলেটির জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস, চেহারাও কিছুটা উজবুকের মত। এই চ্যাংড়া ছেলের ঔদ্ধত্য কেউ সহ্য করতে পারল না; প্রলাপ উক্তি ভেবে উপহাসভরে বলে উঠল—'দ্রোণাচার্যই বটে'। সেদিন মনে বড় ব্যথা পেল নিরুয়া।

হায়, সমালোচকদের হয়তো জানা নেই, উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোশ্লাভ ড্রবনীও একদিন 'বলবয়' ছিলেন। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ফাগু মালীও ছিল মারাত্মক বোলার। তার বলের সামনে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানও ভয়ে বেড়াল হয়ে যেত। ১৯৩১ সালে পাতিয়ালার মহারাজার ইংলণ্ড সফরকারী দলেও ফাগুর স্থান হয়েছিল কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ভারতীয় টেনিসে আজকের সুপরিচিত আকতার আলীরও 'বলবয়' হিসাবে জীবনের সূচনা। গুণের জন্যই গুণীর আদর। পেশা, চেহারা বা ছিন্নবাস গুণকে মলিন করতে পারে না।

গুরুর গুরুর গৌরব দিতে উষার কিন্তু বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই; বরং গর্বভরেই উষা বলে—নিরুয়া কম্পিটিশনে খেললে সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ত।

উষার খেলোয়াড়-জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাবা ডাঃ এন কেশব আয়েঙ্গার সেণ্ট্রাল ফোরসেনিক ইনস্টিটিউটের

ডিরেক্টর। শুধু একজন ক্রীড়ামোদীই নন, ভাল খেলোয়াড়ও। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়ার্ড, ব্রীজ সব খেলাতেই ওঁর ভাল হাত। ওল্ড বালীগঞ্জের ১৪ নম্বর আয়রন সাইড রোডে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারের এক নম্বর ফ্ল্যাটে গেলে দেখা যাবে, ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত পিতাপুত্রীর আলমারি-ঠাসা পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র। ক্রীড়ামোদী হিসাবে উষার মা, বাবার উপরে আর-এক কাঠি। কম্পিটিশনে যেখানেই উষার খেলা, সেখানেই তাঁর উপস্থিতি। মা-বাবার উৎসাহ ও আশীর্বাণীই উষার সাফল্যের অন্যতম সোপান। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের আর এক নাম-করা মেয়ে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তণ গভর্নর এইচ ডি আর আয়েঙ্গার দুহিতা ইন্দিরা আয়েঙ্গার উষাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাই বলছিলাম, উষার খেলোয়াড়-জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাড়িতে খেলাধূলা, লেখাপড়া সঙ্গীত ও শিল্পের সমান চর্চা। তিন সন্তানের মধ্যে উষা প্রথম। ছোট ছেলে কুমার খেলা পাগল। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা সি এল টি'র নৃত্যপটিয়সী। নৃত্য-গীতে উষারও ভাল দখল। কিন্তু যার এক হাতে বি-এ ক্লাসের ইংরেজীর অনার্সের ভারী ভারী বই, আর হাতে টেব্‌ল টেনিসের শক্ত ব্যাট—তার আর সময় কোথায়? তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। খেলায় সুনামের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায়ও চিরদিন সুনাম পেয়েছে এই মেয়েটি। ডায়োসেশান স্কুল থেকে প্রথম ডিভিসনে ম্যাট্রিক এবং লরেটো থেকে প্রথম ডিভিসনে আই-এ পাশ করবার পর এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ইংরেজীর ১৪টি অনার্স ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উষা অন্যতমা।

উষা আয়েঙ্গারকে পুরোপুরি বাঙালী করতে চেয়েছিলেন বাঙলার চিত্র পরিচালকরাও। না হলে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'কান্না' বইতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করাবার জন্য অজস্র টাকার প্রলোভন নিয়ে অগ্রদূত গোষ্ঠী আসবেন কেন সোনার খনির

সোনার মেয়ে ঊষার কাছে? কিন্তু ঊষা সে প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছে। চিত্রজগতের বৈচিত্র্যময় জীবনের চেয়ে সাংসারিক জীবনে লেখাপড়া ও খেলাধূলা তার অনেক—অনেক বেশী পছন্দ। ছায়া লোকের রঙীন স্বপ্ন তার মনে রঙ ধরাতে পারেনি।

তবে সাংবাদিকতায় লোভ আছে। খেলার মত লেখার হাত ও ভাল। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সাময়িকী আগ্রহ করে তার লেখা ছেপেছে।

ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য ঊষা সত্যিই উদ্‌গ্রীব। দুর্গমের দুর্গ থেকে সাধনার ধন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর। বয়স কেবল ১৮। সুতরাং হাতে অফুরন্ত সময়।

লক্ষ্য ভেদে লব্ধ প্রতিষ্ঠা


সবিতা চ্যাটার্জি

ভারতে বীর নারীর বীরত্ব কাহিনীর অভাব নেই। কিন্তু বাঙালী গেরস্থ ঘরের মেয়ে বৌ বন্দুক কাঁধে করে শুটীং রেঞ্জে যাবে, গুলী ছোড়ার প্রতিযোগিতা করবে পুরুষ-মেয়ের সঙ্গে,— কয়েক বছর আগে একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? আজ কিন্তু সব শহর খুঁজলে কিছু কিছু মেয়ে মেলে রাইফেল-রিভলবার যাদের খেলার সাথী; যদিও একটু উঁচু ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের মেয়েদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কারণ রাইফেল চালনার রেওয়াজ বেশ ব্যয়সাধ্য। অবসর সময়ের চিত্তবিনোদন এবং স্পোর্টস হিসেবেই তাঁরা এটা গ্রহণ করেছেন।

তবু মেয়েদের রাইফেল চালনায় আগ্রহের পেছনে একটু ইতিহাসও আছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্র-নায়কদের উদাত্ত আহ্বানঃ "দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ রক্ষার দায়িত্ব এখন ভারতবাসীর। শুধু পুরুষ নয়। দেশ রক্ষায় পুরুষ-নারীর সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। নারীকেও এসে দাঁড়াতে হবে পুরুষের পাশে। যোগাতে হবে সাহস ও প্রেরণা। প্রয়োজন মত হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার, কাঁধে বন্দুক।"

রাষ্ট্রনায়কদের এ আহ্বান বিফল হয়নি। সামরিক বিভাগের

কাজ যুবকদের কাছে এখন আর অপাংক্তেয় নয়। মেয়েদের পক্ষে রাইফেল চালনাও নয় অপরাধ। ভারত স্বাধীন হবার আগে দেশে যেখানে একটিও রাইফেল ক্লাব ছিল না, দেশ স্বাধীন হবার পর সেখানে শ'খানেক রাইফেল ক্লাব গজিয়ে উঠল। স্পোর্টসের মাধ্যমে রাইফেল চালনায় পটু হবার আহ্বানে সাড়া দিল শত শত যুবক-যুবতী।

সাড়া দিলেন সবিতা চ্যাটার্জিও। রাইফেলে রপ্ত হবার বয়স তাঁর তখন প্রায় পেরিয়ে গেছে। চল্লিশের কোঠায় পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু সাহস যোগালেন স্বামী সূর্য চ্যাটার্জি। সূর্য চ্যাটার্জি দু' বছর আগেই সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের সভ্য হয়েছেন। রাইফেল চালনায় কিছুটা সুনামও কিনেছেন। পরে হয়েছেন যশস্বী রাইফেল চালক। স্ত্রীকে তিনি বললেন—শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের বাধা বড় প্রতিবন্ধক নয়। স্ত্রী রাজী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সাল থেকে সূর্য ও সবিতা—স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে রাইফেলের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। পরে ১২ বছরের ছেলে অলোক চ্যাটার্জি ও ছোট মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জিও হলেন রাইফেলের অনুরাগী। গড়ে উঠল এক রাইফেল পরিবার। প্রথমে সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে, পরে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় তাঁদের অনুশীলন।

১৯৫২ সালে সবিতা চ্যাটার্জি রাইফেল ক্লাবে ভর্তি হবার প্রথম বছরেই টালিগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে অল ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিং এর প্রতিযোগিতা। মাত্র ৬ দিনের প্র্যাকটিসে সবিতা চ্যাটার্জি 'প্রোনে' হলেন দ্বিতীয়া। সেই বছর দিল্লিতে জাতীয় রাইফেল চালনায়ও 'প্রোনে' একই স্থান। কিন্তু তারপর বাঙলায় ও ভারতে তাঁর কাছ থেকে 'প্রোনের' প্রথম স্থান কেউ বেশিবার কেড়ে নিতে পারেনি। পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ, দুশো মিটার—'প্রোনের' সব বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞা। 'স্ট্যাণ্ডিং' এবং 'নীলিং'য়েও প্রায় সমদক্ষতা। ৯০ সেকেণ্ডে ১০ রাউণ্ড গুলী ছোড়ার 'টাইম লিমিট' প্রতিযোগিতায়

বরাবর প্রথম স্থান। পিস্তল রিভলবার ছোড়াতেও অসামান্য সাফল্য। বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় মেয়েদের চ্যাম্পিয়নশিপ। কোন কোনবার এক সঙ্গে পনেরো কুড়িটা পুরস্কার লাভ। রাইফেল চালনায় এক গীতা রায় ছাড়া ভারতের আর কোন মহিলার পক্ষেই এ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়নি। জাপানী রাইফেল শুটারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ডাকও পড়েনি আর কোন মহিলার। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভারতে রাইফেল চালনার প্রতিযোগিতায় সবিতা চাট্যার্জি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা।

'পতি পরম গুরু'। গার্হস্থ ও ধর্ম জীবনে তো বটেই, রাইফেল চালিকা সবিতা চ্যাট্যার্জির রাইফেলে পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রেও অক্ষরে অক্ষের সত্য।

গুরু দোণাচার্য শিষ্যদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবার সময় গাছে একটা পাখী দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—

'গাছে কি দেখছ?'

'একটা পাখী।'

'তুমি কি দেখছ?'

'একটা পাখীর মাথা।'

'অর্জুন, তুমি কি দেখছ?'

'শুধু চোখ।'

এবার মনের মত উত্তর। পাখীও না, পাখীর মাথাও না। শুধু চোখ। এমন দৃষ্টি, এমন একাগ্রতা না হলে কি ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া যায়? একাগ্রতাই তো লক্ষ্যভেদের মূল কথা।

এখানে পতি গুরু, পত্নী শিষ্যা। যে আন্তরিকতা নিয়ে পতি বিদ্যা দান করেছেন ততোধিক আন্তরিকতার সঙ্গে পত্নী তা গ্রহণ করেছেন। তাই বাঙলার রাইফেল চালনার ইতিহাসে এস এন চ্যাটার্জি ও সবিতা চ্যাটার্জির নাম সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

শুধু কি শিক্ষা ও সম্মান? বাঙলার রাইফেল চালকদের জন্য পরলোকগত এস এন চ্যাট্যর্জি ছিলেন বাটা কোম্পানীর চীফ সেক্রেটারী। পয়সার অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু পয়সা থাকলে ক'জনের সে পয়সা খরচ করার 'দিল' থাকে? নিজের জন্য যদিও বা কেউ করে, পরের জন্য খরচ করার দৃষ্টান্ত বিরল।

এস এন চ্যাটার্জি নিজের এবং স্ত্রী-পুত্রের জন্য রাইফেল চালনার অনুশীলনে মাসে খরচ করতেন হাজারখানেক টাকা। কিন্তু ক্লাবের ছেলেমেয়েদের গুলীর খরচের জন্য তাঁর পকেট থেকে মাসে মাসে আরও হাজার দুই করে টাকা বেরিয়ে যেত। রাইফেল চালনায় যার হাত ভাল দেখতেন তারই জন্য দরাজ হাতে তিনি খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। বলা বাহুল্য, রাইফেল স্পোর্টসে স্বামীর এই আগ্রহই স্ত্রীকে আগ্রহশীল করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েকেও। পুত্র অলোক চ্যাটার্জি এবং মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জিও রাইফেল চালনার জুনিয়র বিভাগে একাধিক পুরস্কার ঘরে তোলেন। বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়ানুরাগী দম্পতি ও পরিবারের অভাব নেই। খুঁজলে আমাদের দেশেও ক্রীড়ানুরাগী বহু পরিবারের সন্ধান মেলে। কিন্তু চ্যাটার্জি পরিবারের মত এমন পরিবারও খুব বেশী মেলে না।

আর একটি বিষয়ে এ পরিবারে একটা চমৎকার মিল দেখছি। সূর্য চ্যাটার্জি ও সবিতা চ্যাটার্জি—স্বামী-স্ত্রীর নামের একই অর্থ। রাইফেল ক্ষেত্রেও দু'জনের সমান প্রতিষ্ঠা। বড় মেয়ে নমিতা চ্যাটার্জির স্বামী জগদীশ গোপাল কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। নমিতা গোপালও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেছেন। এখন স্বামী-স্ত্রী ব্যারিস্টার। ছোট মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জি নাম করা সঙ্গীত শিল্পী। বিয়ে করেছেন সঙ্গীতজ্ঞ শ্যামল বসুকে। স্বামী-স্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞ। যাক সে কথা।

শ্রীযুক্তা সবিতা চ্যাটার্জির শিশুকাল কেটেছে রাঁচিতে। বাবা বসন্ত বন্দোপাধ্যায় ছিলেন রাঁচির উকীল। ছোটবেলায় আগ্নেয়

অস্ত্রে আগ্রহ ছিল না। তবে আদিবাসীদের তীরধনুক ছুড়তে দেখে তাঁরও তীরধনুক ছুড়তে শখ হয়েছিল। একটু রেওয়াজও করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তা কাজেও লেগেছে। ১৯৫৬ সালে আমেদাবাদে জাতীয় রাইফেল শুটিং-এর আসর। তার পাশেই ধনুর্বিদ্যা প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সবিতা চ্যাটার্জি তাতে যোগ দিয়ে-ছিলেন। পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

'রাইফেল চালনার শখ এলো কোথা থেকে?'

প্রশ্ন করেছিলাম মিসেস চ্যাটার্জিকে। তার উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তাতে বুঝেছি এদের রক্তের সাথেই মিশে আছে রাইফেলের নেশা।

এস এন চ্যাটার্জির বাবা ফণীন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি ছিলেন পাবনার জেলা জজ। সেই সূত্রেই বাঙলা তথা ভারতের বিখ্যাত শিকারী কুমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। সে কুমুদ চৌধুরী বাঘের হাতেই মারা গিয়েছেন। কুমুদ চৌধুরীর সান্নিধ্যেই শিকারে অনুরাগ। পুত্র এস এন চ্যাটার্জির মধ্যেও সেই নেশা সংক্রামিত।

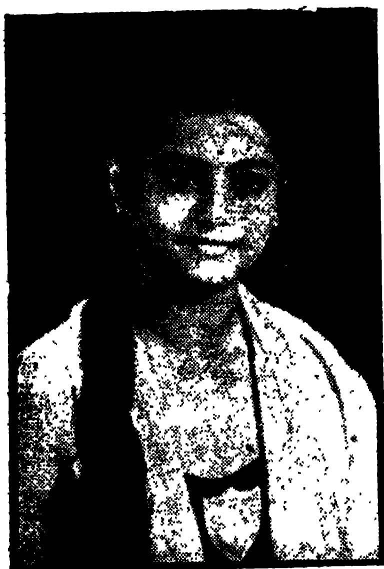
বিয়ের পর সবিতা চ্যাটার্জিকে নিয়ে শিকারের জন্য নানা যায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এস এন চ্যাটার্জি। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নানা জঙ্গলে খুঁজলে হয়তো এখনো তাঁদের পায়ের চিহ্ন দেখা যাবে। এমন কি, পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা পর্যন্ত তাঁরা শিকারে গিয়েছেন।

যদি কোনদিন আপনার নিউ আলিপুরের 'জি' ব্লকের 'সূর্য দেউল'-এ যাবার সুযোগ ঘটে, তবে দেখতে পাবেন চ্যাটার্জি দম্পত্তির শিকারের চিহ্ন। হরিণ, বাইসনের মাউণ্ট করা মাথা দেওয়ালের গায়ে মুখ উঁচু করে চেয়ে আছে সজল চোখে। 'সূর্য দেউল'-এর একতলার সাজানো ঘরে দেখতে পাবেন রাইফেল প্রতিযোগিতা থেকে চ্যাটার্জি দম্পতির আহরিত কাপ মেডেল চারটি আলমারীতে থরে থরে সাজানো। সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে উঠে যান, সেখানে এক

আলমারী ঠাসা দামী দামী রাইফেল, রিভলবার। কোনোটা 'অ্যান্‌স্নুলজ' কোনোটা 'মার্টিনী' কোনোটা 'হ্যামারলী' কোনোটা বা 'ওয়ালথার'। সবসুদ্ধ ১১টা রাইফেল আর ৯টা রিভলবার। সযত্নে রক্ষিত। তবে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর চেহারা বড় করুণ। যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ৩ বছর হ'ল এস এন চ্যাটার্জি পরলোকগমন করেছেন। মিসেস সবিতা চ্যাটার্জি রাইফেল চালনা এক রকম ছেড়ে দিয়েছেন। পুত্র অলোক চ্যাটার্জি বিলেত থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সদ্য দেশে ফিরেছেন। এখনো রাইফেলের রেওয়াজ আরম্ভ করেননি। তাই বড় করুণ চেহারা এই ভীষণ অস্ত্রগুলোর।

এক সঙ্গে এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র দেখে মিসেস চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'যার জিনিষ তিনি তো চলে গেছেন, পুলিস থেকে কোন উৎপাত হয়নি তো ?' মিসেস চ্যাটার্জি বলেছিলেন—'না, সব-গুলোর লাইসেন্সই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম নামে। তাই কোন উৎপাত পোহাতে হয়নি।'

সাঁতারের সন্ধ্যা-তারা



সন্ধ্যা চন্দ্র

আমাদের দেশে সাঁতারপটু মেয়ের অভাব নেই। সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, আরতি সাহা, বন্দনা মার্চেন্ট, ফেনী মিস্ত্রী, মীরা কারিয়াপ্পা, অনুরাধা গুহঠাকুরতা—এমনি আরও কত নাম, আরও কত সাধারণ অসাধারণ সাঁতারু মেয়ে। একটু পিছন দিকে যদি ফিরে চাই তা হলে দেখতে পাই ডলী নাজির, সুখলতা পাল, সাবিত্রী খণ্ডেলওয়াল, বাণী ঘোষ, লীলা চ্যাটার্জি প্রভৃতিকে, সাঁতারের অসামান্য সাফল্যে সারা ভারতে যাঁরা সুপরিচিত। কিন্তু এদের মধ্যে যদি কেউ অসাধারণত্বের দাবি করতে পারে তা হলে দু'টি মেয়ে—আরতি সাহা ও সন্ধ্যা চন্দ্র।

সন্ধ্যা অবশ্য সাগরপারে গিয়ে আরতির মত সাড়া জাগাতে পারেনি, কিন্তু নিজের দেশের সাঁতার প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যার কাছে আরতির কৃতিত্বও অতিক্রান্ত।

আমি কাকেও ছোট করতে চাই না। তবু বলবো এই একটি মেয়ে, যার একার কৃতিত্বে বাঙলা আজ ভারতীয় সাঁতারের শীর্ষ-দেশে। বাঙলার সাঁতার-আকাশে সন্ধ্যার উদয় সন্ধ্যাতারার মত ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মেয়েদের সাঁতারে বোম্বের মেয়েরাই ছিল পুরোভাগে। আর প্রায় সমস্ত ভারতীয় রেকর্ডের

অধিকারিণী ছিলেন ডলী নাজির। প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই বোম্বের এই বিজয় বৈজয়ন্তী। কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে পালা বদল, এবার সন্ধ্যা চন্দ্রকে কেন্দ্র করে বারবার বাঙলার টীম চ্যাম্পিয়নশিপ। শুধু ১৯৫৯ সাল ছাড়া, যে বছর জাতীয় সাঁতারে সন্ধ্যা যোগ দেয়নি। অবশ্য সন্ধ্যার প্রয়োজন ছিল না। যে কোন একটি সাঁতারু মেয়েকে দলে পেলে এ বছরও বাঙলা চ্যাম্পিয়নশিপ পেত।

তবে সন্ধ্যা যোগ দিলে লাভ হত তার নিজেরই বেশী। কারণ দু'তিনটি বিষয়ের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করে দিলেও এক একশ' মিটার ব্যাক স্ট্রোক ছাড়া আর কোন ভারতীয় রেকর্ডের পাশে সন্ধ্যার নাম লেখা ছিল না। দু'শ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড করার জন্য তাকে এক বছর দেরি করতে হয়েছে।

একশ' মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ডে সন্ধ্যার নাম লেখা হয়নি এক অদ্ভুত কারণে। কারণটা বে-আইনী এবং তার জন্য দায়ী সুইমিং ফেডারেশনের বিধিব্যবস্থা। ১৯৪৮ সালে পাম ব্যালেণ্টাইন নামে একটি ইংরেজ মেয়ে সাময়িকভাবে বোম্বেতে বসবাস করবার সময় জাতীয় সাঁতারে যোগ দিয়ে একশ' মিটারে রেকর্ড করেছিল। আজও সেই রেকর্ড নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছ। অথচ অ-ভারতীয়র অপবাদে ব্যালেণ্টাইনকে অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। অ-ভারতীয়র এই ভারতীয় রেকর্ড ভাঙ্গবার জন্য সন্ধ্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অষ্টাদশী এই মেয়েটির সাঁতার-জীবনের সূচনা কলকাতার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে। গুরু সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের চীফ 'কোচ' শ্যামাপদ গোস্বামী। সাঁতারক্ষেত্রে যিনি গোসাইদা নামে সুপরিচিত। সন্ধ্যাদের বাড়ি হেদো থেকে হাত কয়েক দূরে। ২০।১।১ মদন মিত্র লেনে। হোদো থেকে হাঁক দিলে হয়তো ডাক শোনা যায়। জ্যাঠাবাবু নন্দলাল চন্দ্রর হাত ধরে সন্ধ্যা রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে যেত হেদোয়, আর দেখতো চেনা অচেনা কত ছেলে মেয়ে জলের বুকে

বুক রেখে নানা ছন্দে সাঁতার কাটছে। মোটামত এক ভদ্রলোক কত যত্ন নিয়ে তাদের সাঁতারের ছলাকলা শেখাচ্ছেন।

সন্ধ্যার নিজের কথাঃ "রেলিং-এ ভর দিয়ে হেদোর কোলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর তন্ময় হয়ে যেতাম সাঁতার দেখতে দেখতে। শিশু-মনের কৌতূহল কত কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে উঠতো। ভাবতাম কি মজা ওদের। কেমন জলের বুকে খেলা করে। আমারও মন নেচে উঠল সাঁতার কাটতে। বাড়ি গিয়ে সে কথা জানাতেই জ্যাঠাইমার মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল। বললেন—'ঘরের মেয়ে সবার সামনে সাঁতার কাটবে? ওমা সে কি কথা! ওসব হবে না।' এক নিমেষেই আমার সাঁতার শেখার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কল্পনার জাল গেল ছিঁড়ে।"

কিন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে অভীষ্ট একদিন সিদ্ধ হয়। আর এক সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই মোটা ভদ্রলোক স্নেহমাখা স্বরে বললেন—"খুকি, তুমি সাঁতার শিখবে?"

—"শিখব। কিন্তু বাড়ির যে আপত্তি।"

—"বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে বল। আপত্তি হবে না।"

সত্যি আর অপত্তি হ'ল না। সন্ধ্যা আবার সাঁতার শেখবার প্রস্তাব করতেই জ্যাঠামশাই নন্দলাল চন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। ৮ বছর ১১ মাস বয়সে হল সন্ধ্যার সাঁতারের হাতে খড়ি।

মোটা লোকটি আর কেউ নন—চীফ কোচ গোঁসাইদা। তিনি নীলুদার হেপাজতে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন শুধু বাঁশ ধরিয়ে 'পা' করাবে। পা করাবে মানে ছুটি পা পর্যায়ক্রমে জলের মধ্যে উঠবে আর নামবে। হাতের কোন কাজ নেই। সাঁতার শিক্ষকদের মতে পায়ের কাজ ভাল হলে হাতের কাজ শেখাতে বেশী দেরি হয় না। সন্ধ্যা রোজ ক্লাবে আসে আর নীলুদার তত্ত্বাবধানে পায়ের প্র্যাক্টিস করে। আস্তে আস্তে তার হাতও চলতে আরম্ভ করে। তবু 'নভিস' অর্থাৎ আনাড়ি সাঁতারু। এটা ১৯৫২ সালের কথা।

সে বছর ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় নভিসদের ৫০ মিটারে সন্ধ্যা হল দ্বিতীয়। প্রথম পদক্ষেপে প্রথম সাফল্য বড় হবার সাহস এনে দিল। নতুন উদ্যমে সাঁতার শিখতে লাগল সন্ধ্যা চন্দ্র। 'মেয়েটির স্টাইল তো বেশ' বলে এবার সাঁতার শেখাবার ভার নিজের হাতে নিলেন গোঁসাইদা।

১৯৫৩ সালে গঙ্গার বুকে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। আরতি, ভারতী সাহার সঙ্গে সন্ধ্যাও সেখানে অন্যতমা মেয়ে প্রতি-যোগী। হেদো থেকে হুগলী নদীতে সাঁতার। এর আগে সন্ধ্যা কোনদিন নদীতে সাঁতার কাটেনি। তবু চতুর্থ স্থান। হয়তো আর একটু উপরেও স্থান পেতে পারতো, কিন্তু কি একটা জন্তু তার সামনে স্রোতের টানে ভাসছিল আর ডুবছিল। ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা। নিজে বলেছে—"একরকম চোখ বুজে সাঁতার কাটছিলাম, মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখছিলাম জন্তুটি আমার কত কাছে। তখন কি জানতাম ওটা শুশুক ?"

১৯৫৪ সালে লেকে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা এবার সবার আগে শেষ সীমায়। এখন সে পাকা-পোক্ত সাঁতারু মেয়ে।

১৯৫৫ সাল থেকে সন্ধ্যার সাঁতার জীবনে সম্মান লাভের সূত্রপাত। রাজ্য সাঁতারের এক শ' ও চার শ' মিটার ফ্রি স্টাইল এবং এক শ' মিটার ব্যাক স্ট্রোক—তিনটি বিষয়েই প্রথম—উপরন্তু চার শ' মিটারে নতুন রেকর্ড।

পরের বছর এই রেকর্ডের আরও উন্নতি। এক শ' মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ব্যাক স্ট্রোকেও নতুন রেকর্ড। দু শ' মিটার ফ্রি স্টাইলে সন্ধ্যার কাছে আরতির পরাজয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল সন্ধ্যার জীবনের স্মরণীয় তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে সে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু ডলী নাজিরকে হারিয়েছে, দিন দিন 'সময়ের' উন্নতি করে আগেকার অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছে আর গড়েছে।

যেখানে সময়ের ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের উন্নতি করতে বহু চেষ্টা, বহু অনুশীলন ও বহু সাধনার প্রয়োজন সেখানে চার শ' মিটার ফ্রি স্টাইলে ডলী নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড প্রায় ৮ সেকেণ্ডে কমিয়ে আনা সন্ধ্যার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তবু সন্ধ্যা রেকর্ডের অধিকারিণী নয়। কারণ জাতীয় সাঁতারের আসরে রেকর্ড করা না হলে তার মর্যাদা দেওয়ার বিধান নেই।

সাঁতারের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনা করলে সন্ধ্যা অবশ্য এখনো অনেক পিছনে। তবু আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি যোগ্যতার মাপ-কাঠিতে রোম অলিম্পিকগামী ভারতীয় দলে সন্ধ্যার ঠাঁই হল। অলিম্পিক অঙ্গনে দেশের প্রতিনিধিত্ব? এত বড় সম্মান! আনন্দে নেচে উঠল ছোট মেয়েটির ছোট্ট হৃদয়। কিন্তু অলিম্পিকের কর্মকর্তারা সন্ধ্যাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।' বিদেশী অর্থের অভাবে ভারতীয় দল থেকে কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়া হল অনেকের নাম। সেই সঙ্গে সন্ধ্যার নামও কাটা পড়ল। প্রতিভা স্ফুরণেব মুখে কেটে খান খান করা হল একটি ছোট মেয়ের বড় আশা।

"ছাত্রী তো আরও আছে, সাঁতারে সন্ধ্যার এতখানি সাফল্যের কারণ কি?"

প্রশ্ন করেছিলাম সন্ধ্যার কোচ গোঁসাইদাকে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনাই সন্ধ্যার সাফল্যের মূল সূত্র। তার চেয়ে বড় কথা জলকে সে ভালবাসে, জলও তাকে ভালবাসে। সাঁতারকে সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। সাঁতার কাটার নিখুঁত পদ্ধতি আমি তাকে বরাবর শেখাতে চেষ্টা করেছি।

"সন্ধ্যা সাঁতার কাটে ১×৪ বিট 'ক্রলে' অর্থাৎ একবার হাতের টানের মধ্যে ৪ বার পা ওঠা-নামা করে। সোজাভাবে হাত চালাতে তাকে বরাবর বারণ করে এসেছি। এতে জোর কম হয়। রাইট অ্যাঙ্গেলে কনুই বেঁকিয়ে হাত চালালে 'ল্যাটিসিমাস', 'আর্ম',

'ফোরআর্ম' ও 'শোল্ডার মাস্‌ল্' একসঙ্গে কাজ করে, টানে জোর হয়, সাঁতারের গতিবেগও অনেক বেড়ে যায়। সন্ধ্যা এই পদ্ধতিতে সাঁতার কাটে। তা ছাড়া ওর 'বোয়েন্সি' ও 'গ্লাইড' খুবই ভাল। কাঠের মত জলের উপর ভেসে থাকে, গতি স্বচ্ছ বর্শা-ফলকের মত।"

সন্ধ্যার বাবার নাম তারকচন্দ্র চন্দ্র। কাজের জন্য তিনি থাকেন প্রায়ই কলকাতার বাইরে, কিন্তু বাবার সব দায়িত্ব পালন করেন নিঃসন্তান জ্যাঠাবাবু নন্দলাল চন্দ্র। আর একজনও সন্ধ্যার কাছে পিতৃতুল্য। বলা বাহুল্য, তিনি সাঁতারের শিক্ষাগুরু শ্যামাপদ গোস্বামী, অর্থাৎ গোঁসাই দা।

অনেকের ধারণা ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ডাঃ বিমল চন্দ্র সন্ধ্যার সহোদর ভাই। ভাই বটে, তবে সহোদর নয়, রক্তের সম্বন্ধও নেই। একই ক্লাবের দুই কৃতী সাঁতারুর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বছর বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ও পারস্পারিক উপহার বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এই ভ্রাতৃ-বন্ধন আরও দৃঢ় হচ্ছে।

সন্ধ্যা চন্দ্র এখন সেট মার্গারেট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। এই বছরই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। মেয়েটি শুধু সাঁতারেই সুপটু নয়। হাতের কাজ এবং ড্রইং সুন্দর। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে সাঁতারের কোচ জন মার্শাল কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি সন্ধ্যাকে সাঁতারের যেসব পাঠ শিখিয়ে গেছেন তার 'ডায়গ্রাম' সন্ধ্যার নিজের হাতেই আঁকা। গানও একটু জানে।

সন্ধ্যার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য কতবার যে তার স্কুলের মেয়েরা এক সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ করেছে তার হিসাব-নিকাশ নেই। আর একটি বলবার মত ঘটনা যে জ্যাঠাইমা বলেছিলেন "ঘরের মেয়ে সবার সামনে সাঁতার কাটবে? সে কি কথা?" সেই জ্যাঠাইমাই এখন সন্ধ্যার রাশি রাশি পুরস্কারের সতর্ক প্রহরী।

খেলার মাঠে ঘরের বৌ



তৃপ্তি মুখার্জী

আজ যে মেয়েটির কথা বলছি ঘরসংসারের কাজ আর বাইরের খেলাধূলা তাঁর কাছে সমানপ্রিয়। অ্যাথলেটিকসে এ মেয়েটি ছিল এক সময়ে বাঙলার এক নম্বর মেয়ে—'ফাস্টেট গার্ল অব দি স্টেট'। এখন ফাস্ট উওম্যান অব দি স্টেট। কারণ সিঁথিতে সিঁদুর পরবার পর আর কোনো মহিলা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পাল্লা টেনেছেন বলে আমার জানা নেই।

বিয়ের পর অনেক মেয়েকে টেনিস বা ব্যাডমিণ্টন খেলতে দেখেছি। অফিসের স্পোর্টসে বিবাহিতা চাকুরে মেয়ের শখ করে দৌড়োবার নজীরও হয়তো আছে। কিন্তু বিভিন্ন 'ওপেন স্পোর্টসে' এবং স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে বিবাহিতা মহিলা প্রতিযোগিনী হিসাবে তৃপ্তি মুখার্জীই বাঙ্গলার প্রথম।

উত্তরপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সিভিল সার্জন ডাঃ মহেন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা তৃপ্তি। খুব ছোটবেলা থেকেই তৃপ্তির খেলাধূলায় আগ্রহ। সেই আগ্রহে ইন্ধন যোগান দাদা জিতেন ভট্টাচার্য, এখন যিনি চিত্তরঞ্জন টেকনিক্যাল স্কুলের প্রোফেসার। জিতেনবাবু নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন। তাই বোনের খেলাধূলার আগ্রহে কোনোদিন অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি। বরং সব সময়ই উৎসাহ দিয়েছেন।

উত্তরপাড়া স্কুলে পড়বার সময় উৎসাহ দিয়েছেন গেম টিচার রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পাতলা গড়নের ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে তৃপ্তি ভট্টাচার্য। সবুজ ঘাসের বুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে উড়ে যায় সবার আগে। বালী-উত্তরপাড়ার ছোট ছোট স্পোর্টসে কোন মেয়েই আর তৃপ্তির নাগাল পায় না। বালী মিল মাঠে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দৌড়ের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খেলার সঙ্গে পড়ার বিরোধ বাধে। পড়ার চাপে স্পোর্টস চাপা পড়ে যায়। একটি সম্ভাবনাময় বাঙ্গালী মেয়ের স্পোর্টসের দক্ষতা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে ওর ভার নেন বাঙলার দৌড়পটু অ্যাথলেট অমিয় মুখার্জী। ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের এক শো ও দু' শো মিটার দৌড়ে তৃপ্তি পায় তৃতীয় স্থান। ১৯৫৮ সালে এক শো মিটারে দ্বিতীয় দু'শোতে প্রথম। পরের বছর দু'টোতেই শীর্ষস্থান। শুধু শীর্ষস্থানই নয়। এ বছর নীলিমা ঘোষের রেকর্ড তৃপ্তি স্পর্শ করবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু অল্পের জন্য পারল না। এক শো মিটার দৌড়ে নীলিমার রেকর্ড ১৩ সেকেণ্ড। তৃপ্তি করল ১৩·১ সেকেণ্ড। তবু বাঙলার 'ফাস্টেস্ট গার্ল'। জাতীয় অ্যাথলেটিকসে বাঙলার মেয়ে টীমের অধিনায়িকা তৃপ্তি ভট্টাচার্য।

বাঙলার ফাস্টেস্ট বয় তখন শ্রীরামপুরের অমিয় মুখার্জী। এক শো মিটার দৌড়ে যার ১০·৮ সেকেণ্ডের রাজ্য রেকর্ড আজও কেউ ভাঙ্গতে পারেনি। তৃপ্তির বাবা ডাঃ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য অমিয়কেই তাঁর যোগ্য জামাতা হিসাবে মনে করলেন। অমিয়র বাবা অধ্যাপক নরেন মুখার্জীও ভাবী বৈবাহিকের ইচ্ছায় বাদ সাধলেন না। উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুরে কিছুদিন কথা চালাচালি হবার পর ১৯৫৯ লালের ২৪শে শ্রাবণের গোধূলি লগ্নে অমিয় ও তৃপ্তির বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর কিছু দিনের বিশ্রাম। তারপর আবার স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম অনুশীলন এবং যথারীতি স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ।

সবাই দেখে অবাক হয়ে যায়। মেয়েদের তো কথাই নেই। 'ওমা, ঘরের বউ মল্লমদ্দদের সাথে মাঠে ঘাটে দৌড়ে বেড়ায়! কেউ বাধা দেয় না?' কিন্তু তৃপ্তি বা অমিয়র তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা অ্যাথলেটিকসের পূজারী। গার্হস্থ্য ধর্মের মতই তারা স্পোর্টসকে ধর্ম বলে মনে করে। অমিয়দের রক্ষণশীল পরিবারেও কোন কথা ওঠে না। বাবা, মা, দাদা, বউদি বলেন—ওরা স্বামী-স্ত্রী যদি এর মধ্যে আনন্দ পায় আমাদের বলবার কি আছে? ওদের আনন্দতেই আমাদের আনন্দ। বিবাহিত জীবনে তৃপ্তির উৎসাহ আরও বেড়ে যায়।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চা খাবারের ব্যবস্থা করা, ৮টার মধ্যে স্বামী অমিয় মুখার্জীর অফিসের ভাত রেঁধে দেবার পর তৃপ্তির হাতে আর কাজ থাকে না। দুপুরে বিশ্রাম। বিকেলে শ্রীরামপুর কলেজ মাঠে দৌড়ের অনুশীলন ও ব্যায়াম এই হচ্ছে তৃপ্তি মুখার্জীর এখনকার দৈনন্দিন কাজ। বিকেলের রান্নার ভার বড় জায়ের উপর। তৃপ্তির আগ্রহ দেখে কলেজ মাঠে অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীরামপুর কলেজের রেক্টর শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে তিনবার বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া তৃপ্তি মুখার্জী আন্তঃ রেল স্পোর্টসে প্রতিযোগিতা করেছেন দু'বার। প্রথম ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে। ইস্টার্ন রেলের খেলাপাগল পাবলিক রিলেসন্স অফিসার শ্রী কে কে দাশের প্রচেষ্টায় এ বছর লিলুয়ার ডি সি ও এস অফিসে তৃপ্তি এক চাকুরি পেয়েছিলেন। তার ফলেই আন্তঃ রেল স্পোর্টসে এঁর অংশ গ্রহণ এবং এক শো মিটারে দ্বিতীয় এবং দু'শো মিটারে তৃতীয় স্থান। লিলুয়া অফিসে তৃপ্তি আট মাসের বেশী কাজ করেন নি।

পরের বছর দিল্লিতে আন্তঃ রেল স্পোর্টসে তৃপ্তির অংশ গ্রহণ স্বামীর দৌলতে। তবে এর পেছনে যাঁর সহৃদয় আন্তরিকতা ছিল তিনি হচ্ছেন সাউথ ইস্টার্ন রেলের সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার

মিঃ আমেদ। অমিয় মুখার্জী সাউথ ইস্টার্ন রেলের অফিসে সিনিয়র পার্সোনেল দপ্তরেরই কর্মী। রেলকর্মীদের ছেলে মেয়ে বৌয়েরও আন্তঃ রেল স্পোর্টসে যোগদানের অধিকার আছে। সেই যোগ্যতায় তৃপ্তি মুখার্জী ১৯৬০ সালে আন্তঃ রেল স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ করে এক শো ও দু'শো মিটার দৌড়ের দুই বিষয়েই দখল করেন দ্বিতীয় স্থান। রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপেও এ বছর দুই বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় স্থান বাজায় থাকে।

১৯৬১ সালের স্পোর্টস মরসুমে তৃপ্তি আশানুরূপ সাফাল্য অর্জন করতে পারেন নি। এ বছর তিনি অনেক ভাল করবেন বলে আশা রাখেন।

স্পোর্টস ছাড়া কুমারীজীবনে নৃত্যকলাপটিয়সী হিসাবেও তৃপ্তির সুনাম ছিল। কিন্তু নাচের চর্চা অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে স্পোর্টসের জন্য। নাচের চেয়ে স্পোর্টসের মধ্যে অনেক বেশী আনন্দ তৃপ্তি মুখার্জীর। তাই স্পোর্টসকে ছাড়তে তিনি রাজী নন। কোন অসুবিধাও নেই স্পোর্টসের সাধনায়। বয়স মাত্র ১৯ বছর। স্বামী-স্ত্রী একই পথের পথিক। তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবার সময় গৃহ দেবতার কাছে সংসারের মঙ্গল কামনার সঙ্গে তৃপ্তি মুখার্জীর আর একটি প্রার্থনা হচ্ছে অ্যাথলেটিকসে স্বামী-স্ত্রীর উন্নতির প্রার্থনা। বাঙলার এক আদর্শ অ্যাথলেটিক দম্পতি অমিয় ও তৃপ্তি মুখার্জী।

অ্যামাজোন থেকে অ্যামেজিং



অনীতা মুখার্জি

ষোলো বছর আগের কথা। ক্যালকাটা নার্সিং হোমে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন মিসেস কমলা মুখার্জি। আধো নিদ্রিত আধো জাগ্রত। যাকে বলে 'টুইলাইট স্লিপ'। এমন সময় ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার কর্নেল এস সি মিত্র এসে বললেনঃ "মিসেস মুখার্জি শুনছেন—আপনার একটি 'অ্যামাজোনিয়ান' মেয়ে হয়েছে।"

প্রথম দুটি পুত্রসন্তানের পর একটি মেয়েকেই কোলে নিতে চেয়েছিলেন মুখার্জি দম্পতি। তাকে সাজাবেন গোছাবেন, রঙ-বেরঙের ফ্রক পরাবেন, বব্ছাঁট চুলে ফিতে পরিয়ে দেবেন, মনের মত করে মানুষ করবেন মেয়েটিকে। পরীর মত ফুরফুর করে ঘরে ঘোরাফেরা করে বেড়াবে। এমনি আরও কত রঙীন কল্পনা। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে 'অ্যামাজোনিয়ান' মেয়ের কথা শুনে মিসেস কমলা মুখার্জী প্রথমে যেন খুব খুশী হতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাব ঃ একটি মেয়েই তো চেয়েছিলাম, তার আবার পুরুষালী চেহারা হ'ল কেন? ভাবটা হয়তো বুঝলেন কর্নেল মিত্র। কারণ ডাক্তাররা তো শুধু দেহ বিজ্ঞানীই নন, মনের খবরও তাঁদের রাখতে হয়।

বললেন ঃ "আপনি কী ভাবছেন মিসেস মুখার্জি? মেয়ে

আপনার খুব সুন্দরীই হবে। বেশ বড়সড় হয়েছে। ছেলের মত গড়ন। ওজন ন' পাউণ্ডেরও বেশী। ক্যালকাটা নার্সিং হোমে এত বড় মেয়ে বেশী হয়নি। তাই আমি ওকে 'অ্যামাজোনিয়ান' গাল' বলছিলাম।"

খুশির নেশায় এবার ঘুমিয়ে পড়লেন মিসেস মুখার্জি। স্বপ্নের ঘোরে রঙীন স্বপ্নকেই লালন করতে লাগলেন।

ক্যালকাটা নার্সিং হোমের ষোলো বছর আগের এই মেয়েটি আজকের ষোড়শী অনীতা মুখার্জি। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, নৃত্যগীতপটিয়সী, নামকরা বাঙ্গালী মেয়ে অ্যাথলীট। সাউথ ইস্টার্ণ রেলের সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত কণ্ট্রোলার অব স্টোরস মিঃ ডি আর মুখার্জি ও মিসেস কমলা মুখার্জির একমাত্র কন্যা।

অনীতাকে মনের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন মুখার্জি দম্পতি। তার মধ্যে খেলাধূলা এল কেন? বিশেষ করে অ্যাথ-লেটিকস? এ ত ইংলণ্ড, ইউরোপের অন্য কোন দেশ বা আমেরিকা নয় যে, ধনীর দুলালীরা মাঠের খেলাধুলা নিয়ে মাতামাতি করবে? ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী ডিউক অব এডিনবরা একজন চৌকস খেলোয়াড়। পুত্রের অ্যাথলেটিকসে উঠতি নাম। রাজ-পরিবারের মেয়েরাও দৌড়োদৌড়ি করে। কিন্তু বাঙ্গালী ঘরের ধনীর দুলালীদের অ্যাথলেটিকসে অনীহাই বেশী। তবু অনীতাকে তার বাবা মা অ্যাথলেটিকসে অনুপ্রেরণা দিলেন কেন? তার কারণ, মুখার্জি দম্পতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন খেলাধূলা জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যৌবনে নিজেরাও খেলাধুলা কম করেন নি। মিঃ ডি আর মুখার্জি ছাত্রজীবনে শিবপুরকলেজের 'ক্রস-কান্ট্রি' চ্যাম্পিয়ান। চাকুরিজীবনে ১৯৪৭ সালে কলকাতা-রাঁচি মোটর রেসে তাঁর বিজয়ীর সম্মান। অফিস স্পোর্টসে অফিসার্সদের ভেটারান্স' রেসে বরাবর ফার্স্ট'।

মিসেস মুখার্জি পাঞ্জাবের বাঙালী মেয়ে। ছোটবেলায় লাহোরে

লালিতা-পালিতা। অমৃতসরের স্ট্রাডফোর্ড কলেজে পড়বার সময় অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে যোগ দিয়েছেন। স্পোর্টসের প্রতি চিরদিনই এঁর আসক্তি। পুরীর সমুদ্রের জলে ঢেউ খেতে গিয়ে একবার প্রায় ডুবতে বসেছিলেন। তখন সাঁতার জানতেন না। ফিরে এসে কাঁচড়াপাড়ার রেল সুইমিং পুলে সাঁতার শিখে নিলেন। মেয়ের অ্যাথলেটিকসে আগ্রহ দেখে কিছুদিন আগে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল হবার পরীক্ষা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণা হয়েছেন মিসেস মুখার্জি। ১৯৫১ সালে জলন্ধরে ভারতের জাতীয় খেলাধূলায় তাঁর উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল বাঙলার মেয়ে টীমের ম্যানেজারের দায়িত্ব। মিসেস কমলা মুখার্জি সাউথ ইস্টার্ন রেলে ভারত স্কাউট ও গাইডের স্টেট কমিশনারও।

খেলাধূলায় মা-বাবার এই আগ্রহই অনীতার অনুপ্রেরণা। তার রক্তের মধ্যেই রয়েছে খেলার নেশা। চাকুরিজীবনে খড়্গপুর, বেল-ভেডিয়ার পার্ক, পোর্টল্যাণ্ড পার্ক, গার্ডেনরিচ—যখন যেখানেই মিঃ ডি আর মুখার্জির আস্তানা হয়েছে তখন সেখানেই গড়ে উঠেছে অনীতার খেলাধূলা চর্চার ছোট মাঠ। সাউথ ইস্টার্ন রেলের গার্ডেনরিচের অফিসার্স কোয়ার্টারের ১২।এ, নম্বরে গেলে এখনো দেখা যাবে বাংলোর লনে লং জাম্পের 'পীট', হাই জাম্পের ফ্রেম।

স্পোর্টসে অনীতার প্রথম পাঠ পোর্টল্যাণ্ড পার্কে ভাইয়েদের সাথে। প্রথম সাফল্য ১৯৫৭ সালে সাউথ ইস্টার্ন রেলের ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে। ব্রড জাম্পে অনীতা ফার্স্ট। এক শো ও দু শো মিটার দৌড়ে অনীতা সেকেণ্ড, নীলিমা ফার্স্ট। নীলিমা ঘোষ তখন সাউথ ইস্টার্ন রেলে চাকরি পেয়েছে। বাঙলার প্রাক্তন অ্যাথলেটিক অধিনায়ক অমিয় মুখার্জিও গার্ডেনরিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দপ্তরের কর্মী। মেয়েটির পার্টস দেখে অমিয় ও নীলিমা তাকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলো। ছুটির দিন সকালে, কাজের দিন বিকেলে। অফিসের পর রোজ যায় অফিসার্স কোয়ার্টারে।

দেখিয়ে দেয় দৌড় ও লাফের নিখুঁত পদ্ধতি। কোনো কোনোদিন এলেনবরো কোর্সেও চলে অনীতার অনুশীলন।

১৯৫৭ সালেই কলকাতার ছোট বড় মাঝারি স্পোর্টসের কয়েকটি ছোট-মাঝারি পুরস্কার এলো অনীতার হাতে। দিল্লিতে আন্তঃ রেল স্পোর্টসেও তার ডাক পড়লো। ১৯৫৮ ও ৫৯ সালে আরও কিছু পুরস্কার, আরও একটু উন্নতি! বেহালা অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ব্রড জাম্পে অনীতার লাফ অনেককেই বিস্মিত করল। বেঙ্গল রেকর্ড হয়েছে ধারণা করে বিচারকরা ফিতে নিয়ে দূরত্ব মাপতে গিয়ে দেখলেন ১৫ ফুট ৮¾ ইঞ্চি। গ্লোরিয়া প্রাউলিং-এর ১৫ ফুট ১১½ ইঞ্চি রেকর্ডের একটু কম।

১৯৬০ সাল। দিল্লিতে ভারতের জাতীয় খেলাধূলা। বাঙলার প্রতিনিধিত্বের জন্য ডাক পড়ল অনীতার। তবে জুনিয়র গার্ল হিসাবে। জুনিয়র গার্লদের ব্রড জাম্প ও রিলে দৌড়ে ও পেল দু'টি ব্রোঞ্জ পদক। অর্থাৎ তৃতীয় স্থান। আর একটি ব্রোঞ্জ পদকও ওর হাতে এল। কিন্তু তার মূল্য অনীতার কাছে গোল্ড মেডেলের তুল্য। কারণ এটা পেয়েছিল ও সিনিয়র মেয়েদের রিলে দৌড়ে। মিলখা সিং সাবাস জানালেন মেয়েটিকে।

অলিম্পিকের আগে দিল্লির এই ন্যাশনাল স্পোর্টসের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ভারতের নামকরা সব অ্যাথলীটই রাজধানীতে সমাগত। সবার কৃতিত্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মিলখা সিং তখন উড়ন্ত শিখ—সবার আলোচনার পাত্র। মিলখা তাঁর নামের মর্যাদা রাখলেন তিনটি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করে। এই কৃতিত্বকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ভারতের উঠতি অ্যাথলীটদের নিয়ে মিলখা এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেখানে নিমন্ত্রণ পেলেন বাঙলার একমাত্র কুমারী অনীতা। বলা বাহুল্য, অনীতার মা-বাবাও বাদ পড়লেন না। ভোজ শেষে মিলখা অনীতার মা বাবাকে বললেন, আপনাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওকে

ভালভাবে কোচ করুন। ওখানে থেকে ফিরে আসবার পর অনীতার কোচিং-এর ভার নিলেন অ্যাথলেটিক কোচ বলাই চ্যাটার্জি।

১৯৬১ সালে অনীতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। জলন্ধরে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে সে পেয়েছে চারটি সিলভার মেডেল। ব্রড জাম্প, ছোট মেয়েদের ৫০ মিটার দৌড় এবং ছোট ও বড় মেয়েদের ৪×১০০ মিটারের দু'টি রিলে—সব বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান। জলন্ধরে ৬টি সোনার মেডেলের অধিকারিনী মহীশূরের ক্রিস্টিনি ফোরেজ ব্রড জাম্পে অল্পের জন্য অনীতাকে পরাস্ত করেছেন। রাজস্থান ক্লাব স্পোর্টসে অনীতা ৪টি বিষয়ে প্রথম হয়েছে। যদিও রাজস্থান ক্লাব স্পোর্টস 'ওপেন' বা প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস নয় তবু এখানে যেসব মেয়ে যোগ দিয়েছিল তারা প্রায় সবাই বাঙলার প্রথম স্থানীয়া বাঙালী ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। লা মার্টিনার, সেণ্ট জনস্, মডার্ন হাই, সেণ্ট টমাস, গোখেল, লরেটো, প্রাট মেমোরিয়াল, ওয়েল্যাণ্ড গোল্ডস্মিথ, ডেভিডিয়ান গার্লস প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত ইণ্টার ইয়োরোপীয়ান গার্লস স্কুল স্পোর্টসে অনীতা পেয়েছে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ। এ ধরনের স্পোর্টসে বাঙালী মেয়ের চ্যাম্পিয়নশিপ বোধ হয় এই প্রথম।

রণজি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বার্ষিক 'রেল সপ্তাহ' উপলক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন কুমারী অনীতা তাঁদের অন্যতমা। বেস্ট স্টেশন মাস্টার, বেস্ট কেপ্ট স্টেশন, বেস্ট পুরুষ অ্যাথলীট, বেস্ট মেয়ে অ্যাথলীট প্রভৃতি রেলের বেস্টদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানানো হয় এখানে।

অনীতা এখন লরেটোর ছাত্রী। এ বছরই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবে। ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল এবং টেবল টেনিসেও অনীতার ভাল হাত। তবে এসব খেলাধুলা স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ষোলো বছর আগে কর্নেল এস সি মিত্র যে মেয়েটিকে 'অ্যামা-

জোনিয়ান' বলেছিলেন সে এখন অ্যামেজিং গার্ল। ১৯৫১ সালে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজিত 'মিস বেঙ্গল' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অনীতা পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সম্মান। মিস বেঙ্গল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দেহের সৌন্দর্যই শুধু বিচারের বিষয় ছিল না। ব্যক্তিত্ব, ভঙ্গিমা, বুদ্ধিমত্তা, মুখসৌন্দর্য, চলার ধরন, অঙ্গসৌষ্ঠব, কণ্ঠস্বর এবং মনোহারিত্বের উপর বিচারের মান নির্ধারিত হয়েছিল। মিস বেঙ্গল উপাধি লাভের পর অনীতা যোগ দিয়েছিল বোম্বের 'মিস বিউটি ডেলিগেট কনটেস্টে'। এখানকার প্রথম স্থানাধিকারিণী ক্যালিফোর্নিয়ার লং বিচে আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগ দানের অধিকারিণী। বিউটি ডেলিগেট কনটেস্টে অনীতা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ক্যালিফোর্নিয়া যাবার সুযোগ পায়নি।

আগেই বলেছি, অনীতা নৃত্যগীতেও পটিয়সী। অভিনয়েও দক্ষতা আছে। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'কিং অফ দি ডার্ক চেম্বারে', ও এক প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে অনেকের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তবে খেলাধূলায় ষোড়শী অনীতা এখনো ষোলোকলায় পূর্ণ হয়নি। বাঙলা এবং ভারত তার কাছে আরো কিছু আশা করে।

শকুন্তলার সাধনা



কুমারী শকুন্তলা দত্ত

টেব্‌ল টেনিস পটিয়সী শকুন্তলা দত্তর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার অনুমতি চাইতেই ওর বাবা শ্রীসুধীন দত্ত বললেন—'এখন ওর কথা লেখা কি ঠিক হবে? ও তো এমন কিছু করতে পারেনি।'

সাফল্যের খতিয়ান খতিয়ে দেখতে গেলে হয়তো সুধীনবাবুর সঙ্গে আরো অনেকে একমত হবেন! শকুন্তলা এখনো বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ পায়নি। ভারত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায়ও কোন বার প্রি-কোয়ার্টার-ফাইন্যালের উপরে ওঠেনি, যদিও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন উষা আয়েঙ্গারকে একাধিক প্রতিযোগিতায় শকুন্তলার হাতে হার স্বীকার করতে হয়েছে, ভারতের বহু নামকরা মেয়েও হেরেছেন বাঙ্গলার এই উঠতি মেয়েটির কাছে, তবুও দেশের প্রধান প্রতিযোগিতায় সম্মানের শিখরে আরোহণ শকুন্তলার পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। বাঙলার টেব্‌ল টেনিস র‍্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায় তালিকায় শকুন্তলা দুই নম্বর মেয়ে—ভারতের ক্রমপর্যায়ে ওর তৃতীয় স্থান। এই সম্মানই বা ক'টি বাঙালী মেয়ের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়েছে?

কিন্তু এখানেই শকুন্তলার বিশেষত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় নয়। বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব অন্য কারণে।

প্রথমত—অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার গুণে অতি অল্প সময়ে এই মেয়েটি যে বিদ্যা আয়ত্ব করেছে তার তুলনা কম। কম্পিটিশন খেলতে আরম্ভ করেছে শকুন্তলা ১৯৫৭ সালের শেষভাগ থেকে। এর মধ্যে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে ওঠা, আর তিন বছরই ভারতের জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে প্রশংসা কুড়নো কম কথা নয়। শুধু তাই নয়, মারমুখী 'অ্যাগ্রেসিভ' খেলায় ওর জুড়ি ভারতে বিরল। এ মন্তব্য আমার নয়। টেবল টেনিসের পণ্ডিতদের। আর শকুন্তলার শিক্ষা-গুরু সমীর চ্যাটার্জি তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাঙলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন এবং টেব্‌ল টেনিসের সঙ্গে বিশ কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রেতভাবে জড়িত সমীর চ্যাটার্জি, যিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে বহু কৃতী খেলোয়াড় তৈরী করেছেন, তিনি বলেন—"অপূর্ব শকুন্তলার ফোর-হ্যাণ্ডের মা'র, আর অনলস ওর সাধনা। খেলাকে এমন হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে আমি কোনো মেয়ে কেন, কোনো ছেলেকেও দেখিনি।"

শকুন্তলার বিশেষত্বের দ্বিতীয় কারণ ও হচ্ছে পরিবারের ব্যতিক্রম। ও যে পরিবারের মেয়ে সে পরিবারে খেলাধূলার রেওয়াজ নেই। লেখাপড়া, সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যেরই সেখানে কদর। বাবা মা দু'জনই শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় মানুষ। বড় ভাই সমীন্দ্র মুক-বধির হওয়া সত্ত্বেও নিপুণ শিল্পী, আর্টিস্ট। মেজ ভাই অরুণের নেশা লেখাপড়া। স্কলারশিপ তাকে পেতেই হবে। পেয়েছেও ম্যাট্রিক এবং আই এ-তে। ছোট বোন অনুসূয়াও স্কুলের ফাস্ট-গার্ল। কিন্তু শকুন্তলা?

শকুন্তলা পড়াতেও পেছপাও নয়, খেলাতেও অগ্রণী। এ বছরই বি-এ পাশ করেছে আশুতোষ কলেজ থেকে। তবে ও যেন পড়ার উপরে স্থান দিয়েছে খেলাকে। আর তার উৎসাহ পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। মা কালীপ্রভা দত্ত নৃত্য-গীত এবং খেলাধুলা

পটিয়সী হিসাবে শান্তিনিকেতনে ছিলেন সু-পরিচিতা। অবশ্য বাবা শ্রীসুধীন দত্তের উৎসাহ থেকেও শকুন্তলা বঞ্চিতা হয়নি। তবুও পরিবারের ব্যাতিক্রম বৈকি! একটু বাধাও এসেছিল খেলোয়াড় জীবনে। বৃদ্ধ পিতামহ বললেন—'ও যদি খেলা খেলা করেই আমেদাবাদ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ঘুরে বেড়ায় আর র‍্যাকেট নিয়ে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-তে সব সময় ঠুকঠাক করে তবে পড়বে কখন?' বাবা সুধীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশনের রিপোর্ট খানা নব্বুই বছরের বৃদ্ধ পিতার সামনে মেলে ধরলেন। সেখানে লেখা আছে—'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়ার মতই খেলাধূলা শিখতে হবে। শরীর চর্চা ও খেলাধূলাকে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে দিতে হবে সমান মর্যাদা'। এর পর আর কোন বাধা আসেনি।

শকুন্তলার খেলাধূলার পাঠ গ্রহণের প্রথম জীবনে আর একটি কারণেও বাধা এসেছিল। কারণ কিশোরগঞ্জের কায়স্থকুলের দত্ত-পরিবার শুধু সংস্কৃতির জন্যই বিখ্যাত নন। এঁরা ছিলেন বাংলার স্বনামধন্য শিল্পপতি। ব্যাঙ্ক, বীমা, কাপড়ের কল প্রভৃতি নানা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ঘরে ছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। কিন্তু লক্ষ্মী মুখ ফেরালেন। দৈব দুর্বিপাকে পরিরারের উপর দিয়ে মহা প্রলয় বয়ে গেল। এই প্রলয়ের মধ্যেই শকুন্তলা আরম্ভ করল খেলাধূলা। মনের অদম্য আগ্রহ ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

আর পাঁচজনের মতই শকুন্তলার প্রথম অনুরাগ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে। ও যখন ডায়োসেশানের ছাত্রী তখন পেল গেম-টিচার আরতি মুখার্জি ও অধ্যক্ষা চারুবালা দাশের উৎসাহ। স্কুল স্পোর্টসে দৌড়, লাফ, বর্শা ছোড়া প্রভৃতিতে প্রথম দ্বিতীয় স্থান পেতে আরম্ভ করল। শিশু মনের চাপল্যে বই দিয়ে নেট বানিয়ে, বইকেই টেব্‌ল টেনিস ব্যাট করে খেলা খেলা টেব্‌ল টেনিস ছাড়া আগে কোনদিন সত্যিকার টেব্‌ল টেনিস খেলেনি! ১৯৫৬ সালে রাজকুমারী অমৃত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনামত টেব্‌ল টেনিসের ভ্রাম্যমান কোচ

শিবরামন এলেন ওদের স্কুলে। উষা আয়েঙ্গারও তখন ডায়োসেশানের ছাত্রী। ১৫ দিনের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। সেখানেই সত্যিকারের টেব্‌ল টেনিস ব্যাট হাতে পেল শকুন্তলা। কিন্তু ছাত্রী ভাগাভাগি, সময় ভাগাভাগি, ব্যাট টেবলের ভাগাভাগি। অত ভাগাভাগির মধ্যে শেখার সুযোগ বা সময় কোথায়? নেশা ধরল ওখান থেকেই।

১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ওর আগ্রহ দেখে মা নিয়ে গেলেন ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে খেলা শেখাবার জন্য। বয়স কম বলে ওরা শকুন্তলাকে মেম্বার করতে রাজী হলেন না। এক দরজা বন্ধ তো আর এক দরজা খোলা। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ শকুন্তলাকে মেম্বার করে নিল। কিন্তু সেখানেও পাত পড়ে না। হরিহরছত্রের মেলা। একই রকম ভাগাভাগি। খেলে ওর আশা মেটে না। একটি দুটি গেম খেলে ছল ছল চোখে বসে থাকে অধীর প্রতীক্ষায় আর একটি গেম খেলবার জন্য। তখন শকুন্তলা টেব্‌ল টেনিসের 'নভিস' মেয়ে। লম্বা দোহারা চেহারা বটে, ফোরহ্যাণ্ডের মারও ভাল। কিন্তু আড়স্ট 'স্টিফ' শরীর। খেলায় সাবলীলতা নেই। 'বাঁকা মেয়ে' বলে কেউ বা ঠাট্টা করে। তবে আগ্রহ দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

এই অবস্থায় এগিয়ে আসেন সমীর চ্যাটার্জি। ব্যাট ধরার ত্রুটি শুধরে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় খেলা শেখাতে আরম্ভ করেন শকুন্তলাকে। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হয়ে ওঠে শকুন্তলার কণ্ব মুনির আশ্রম। অনুসূয়া প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বতদের সঙ্গে ওখানেই কাটে তার বেশী সময়।

শিক্ষার ফল ফলতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। ১৯৫৭ সালেই ওর হাত খুলে যায়। ১৯৫৮-তে কটকে পায় ইস্ট ইণ্ডিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ। জীবনের প্রথম বড় সাফল্য। এ বছরে আর আর ছোট বড় সাফল্যের মধ্যে ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ আর

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সের সম্মান। ওয়াই এম সি এ কলেজ স্ট্রীট চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যালে বাঙলার দুই নম্বর মেয়ে মিসেস চমন কাপুরের সঙ্গে খুবই ভাল খেলে এ বছর শকুন্তলা হেরে গিয়েছিল। শকুন্তলার শিক্ষা-গুরু সমীর চ্যাটার্জি তখন চমনকে বলেছিলেন—'দেখেছো শকুন্তলা অল্পদিনে কতখানি উন্নতি করেছে।' উত্তরে চমন বলেছিলেন—'যতই উন্নতি করুক আমাকে হারাতে ওর পাঁচ সাল লাগবে'। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস দু'মাসের মধ্যেই বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে চমন কাপুরকে হার স্বীকার করতে হল শকুন্তলার কাছে।

১৯৫৯ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেব্‌ল টেনিসের আসর। সারা ভাবতের খ্যাতনামা মেয়ে পুরুষ কলকাতায় সমাগত। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তিন বেলা খেলা। সবার মুখে শকুন্তলার প্রশংসা। প্রধানত শকুন্তলার কৃতিত্বেই বাঙলার মেয়েদের টিম সর্বপ্রথম হারালো মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে। হায়দরাবাদের এক নম্বর মেয়ে মীরা জনার্দন, কেরল শ্রেষ্ঠা সীতা আয়ার, মাদ্রাজের কুমারী রুক্মিণী, বোম্বের সরোজ মীরকার একে একে হার স্বীকার করলেন শকুন্তলার কাছে। 'স্টেটসম্যান' লিখল ঃ

In the Bengals women's 3-0 win over Hyderabad and Kerala, Shakuntala Dutta played five aggressive games to beat Mira Janardhan, Hyderabad's No. I and Sita Ayer Keral's No. I.

বোম্বের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'য় লেখা হল ঃ

The deciding tie between Bengal and Bombay had a thrilling finish, Shakuntala Dutta beating Saroj Mirkar by two games to one······Miss Dutta's sweeping forehand had the last 'say' in the games.

জাতীয় প্রতিযোগিতায় শকুন্তলা হারল প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন রাসেল জনের কাছে।

১৯৬০ সালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন উষা আয়েঙ্গারকে দু'বার হার স্বীকার করতে হল দু' বছর আগের সেই বাঁকা মেয়ের কাছে। প্রথম ওয়াই এম সি এ-র কলেজ স্ট্রীটের ফাইন্যালে। পরে সাঁত্রাগাছিতে বাণী নিকেতন টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে। কিন্তু রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে এবারও শকুন্তলা উষার কাছে হেরে গেল।

তবে এই বছরের একটি খেলার কথা শকুন্তলা জীবনে ভুলতে পারবে না। শকুন্তলা কেন? টেব্‌ল টেনিসের অনুরাগী মাত্রেরই এ খেলার কথা চিরদিন মনে থাকবে।

ওয়াই ডব্লিউ সি-এ হলে ওদের চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যাল খেলা। হলে তিল ধরাবার যায়গা নেই। এক দিকে ভারতের দুই নম্বর মেয়ে উষা সুন্দররাজ, অপরদিকে বাঙলার মারমুখী মেয়ে শকুন্তলা দত্ত। উষা সুন্দররাজ, যাকে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রিচার্ড বার্গম্যানের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের মেয়ে বার্গম্যান বলা হয়, তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এদিকে শকুন্তলারও উঠতি সুনাম। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সুতীব্র উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দু'জনে দুটি করে সেট পেল। পঞ্চম সেটে খেলার মীমাংসা। একবার শকুন্তলা, একবার উষা সুন্দররাজ অগ্রগামী। শেষদিকে সুন্দররাজ এগিয়ে গেল ১৮—১২ পয়েণ্টে। খেলায় জয় অনিবার্য। বাঙ্গলার সমর্থকরা হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শকুন্তলা টেবিলের উপর মারের তুফান ছুটিয়ে পরপর ৮টি পয়েণ্ট পেল। এবার শকুন্তলার স্বপক্ষে ২০—১৮ পয়েণ্ট। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শকুন্তলার অসম্ভব জোরের তিনটি ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ অবিশ্বাস্যভাবে তুলে দিয়ে উষা সুন্দররাজ শেষ পর্যন্ত গেম পেল ২২—২০ পয়েণ্টে।

এমনিভাবে একটু অভিজ্ঞতার অভাব, একটু চিত্তচাঞ্চল্য এবং একটুখানি আত্মরক্ষার দুর্বলতায় শকুন্তলাকে অনেক খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ তার হাতে যে মার আছে অনেক নামকরা পুরুষ খেলোয়াড়ের হাতেও সে মার নেই।

এ বছর উষা সুন্দররাজ ও শকুন্তলার খেলা সম্পর্কে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর মন্তব্য ঃ

Shakuntala rose to greater heights in the deciding 5th game in which she kept Usha at bay with a torrent of sizzling forehand killers.

শকুন্তলা চিরদিনই খেলে শক্ত রবার মোড়া ব্যাটে। কিন্তু উষা সুন্দররাজের কাছে পরাজয়ের পর তার 'স্যাণ্ডউইচড' ব্যাটে খেলবার বাসনা হয়। গুরু সমীর চ্যাটার্জিকে এ অভিপ্রায় জানাতেই বার্ণার স্কুলের ছাত্র সমীর আপত্তি করেন। ফলে ওখানেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ইতি পড়ে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে শকুন্তলার আর 'স্যাণ্ডউইচড' ব্যাটে খেলা হয়ে ওঠে না। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস ফেডারেশন 'স্যাণ্ডউইচড' ব্যাটের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

শকুন্তলা এখন নিজেই নিজের শিক্ষাগুরু। অনুশীলনের ত্রুটি নেই। চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ আর ওয়েলেসলী মুসলিম ইনস্টিটিউট তার অনুশীলন ক্ষেত্র। বয়স মাত্র একুশ। মনে তার উচ্চ আশা, সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। খেলার জন্যই চাকরী পেয়েছে ইস্টার্ণ রেলে।

মোমের পুতুল



অরুণা দাশগুপ্ত

চার বছরের মা-মরা মেয়েটিকে নিয়ে মহামুশকিলে পড়লেন বেনারস হিন্দু ইউ-নিভার্সিটির ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর শ্রীঅতীন দাশগুপ্ত। পুতুল খেলার বয়স মেয়েটির। কিন্তু খেলে কার সঙ্গে? বাবা আর মেয়ে। সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই। কি করা যায় মেয়েটিকে নিয়ে? কেমন করে তাকে মানুষ করবেন, কি ভাবে তাকে সঙ্গ দেবেন—এই ভাবনায় অতীনবাবু অস্থির। এমন সময় অতীনবাবু মাথায় এল পুতুল খেলতে না দিয়ে ওকেই পুতুল বানালে কেমন হয়? ঠিক পুতুলের মত গড়ে তোলা যায় না ওকে? কেমন পুতুল? না, মোমের পুতুল। মোমের মত নরম। মোমের মত দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছে ঘোরান যাবে, ওল্টানো যাবে, বাঁকানো যাবে,—ওকে দিয়ে দেখানো যাবে জিমন্যাস্টিকসের যে কোন কষ্টসাধ্য 'ফিগার'। অতীনবাবু ঠিক করলেন ওকে জিমন্যাস্টিকসের 'বোনলেস' অ্যাক্টিভিটি শেখাবেন। তার মধ্যেই আনন্দ পাবে, তার মধ্যেই ডুবে থাকবে মেয়েটি।

অতীন দাশগুপ্ত নিজে ছেলেদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ট্রেনার। তাঁর শিরায় শিরায় খেলার নেশা। মেয়ে অরুণার রক্তের সঙ্গেও

খেলার খেয়াল মিশে আছে। শুধু রেওয়াজের অপেক্ষা। তাই চার বছর বয়সে বাবার কাছে ও জিমন্যাস্টিকসের প্রথম পাঠ আরম্ভ করতেই আস্তে আস্তে জিমন্যাস্টিকসে ওর নেশা ধরে গেল। নেশা থেকে ব্যাধি। সব সময়ই ওই চিন্তা।

সকাল সন্ধ্যেয় অনুশীলন, আর যেখানে জিমন্যাস্টিকস প্রদর্শনীর আয়োজন সেখানেই ভ্রমণ—এই হল অরুণার ব্যাধি সম্বন্ধে তার ট্রেনার বাবার দু'বছরের পেসক্রিপশন।

১৯৫৬ সালে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা ভারতে আসবেন কথাটা প্রচার হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার তখনকার প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন এবং সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সচিব মঃ ক্রুশ্চফ এসেছিলেন ভারত সফরে। রাশিয়ান জিমন্যাস্টদের বিশ্বখ্যাতি এবং তাদের অপরূপ কলা-কৌশলের কথা শুনে বুলগানিন ও ক্রুশ্চফের কাছেই অনুরোধ করেছিলেন ভারতের তখনকার ক্রীড়ানুরাগী স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর একদল রাশিয়ান জিমন্যাস্টকে ভারতে পাঠাতে। সেই ব্যবস্থা মত যৌবনের দ্যুতিতে ভরপুর, অপরূপ দেহশ্রী নিয়ে ১৯৫৬-র মার্চ মাসে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা এসে পৌঁছলেন ভারতে।

অরুণা দাশগুপ্ত চোখভরে দেখল তাদের জিমন্যাস্টিকসের ছলা-কলা। সত্যিই অপরূপ রূপ সৃষ্টি। শিল্পীর লোভ সৃষ্টিকারী নব নব জীবন্ত মডেল—নতুন নতুন ফিগার।

অরুণার শিশুমনে তখন রঙীন কল্পনা। অমনটি হওয়া যায় না? ওই নীনা বোচারভার মত। ওই জিনাইদা রুলিওভার মত। বাঃ, মেরিয়া গোরখোভস্কায়ার কি চমৎকার বীম ব্যালান্সের খেলা! জুগেলী আর পোলিনা ডেনিলোভাই বা কম কিসে? ওরা তো আমার মতই মেয়ে। না হয় একটু বয়স বেশী। তা আমি যদি ওদের মত দিনরাত সাধনা করি তবে আমি ওদের মত হতে পারব না?

জিমন্যাস্টিকসে পটু হবার জন্য তখন থেকে অরুণার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হল। ১৯৫৭ সালে রণজি স্টেডিয়ামের যুব উৎসবে মেয়েটির জিমন্যাস্টিকসের ছলা-কলা দেখে উৎসবের উদ্যোক্তারা ওকে মস্কো নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু কি কারণে ওর যাওয়া হয়ে উঠল না। দূরপাল্লার সফর বাতিল হল। কিন্তু অরুণা শরীরচর্চাবিদ মনোতোষ রায়ের সঙ্গে কলম্বো ঘুরে এল। কলম্বোতে ও পেল দর্শকদের সম্বর্ধনা আর সমজদার কাগজের প্রশংসা।

রাশিয়ানদের নিয়ে আবার সোরগোল উঠল। ময়দানে ক্যালকাটা মাঠের পেছনে রাশিয়ান সার্কাসের ছাউনিতে একটি মেয়ে আছে যার দেহে নাকি হাড়গোড় নেই, শিরা উপশিরাগুলি রবারের, আর শরীর নাকি শোলার মত হালকা। পিঠের দিক দিয়ে পা দুখানি মাথায় মিশিয়ে দুখানি হাত দু দিকে প্রসারিত করে সে নাকি টেবিলের ওপর রাখা একটি ছোট্ট দণ্ড দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে 'বায়ুভূত নিরাশ্রয়ী'র মত শূন্যে মিনিট-খানেক ঝুলে থাকে। ও বিদ্যার নাম 'প্লাস্টিকস স্কেচ'। সবাই দেখে তাজ্জব বনে যায়। ভাবে এও কি সম্ভব?

এ যে সম্ভব তার প্রমাণ দিল কুমারী অরুণা আট বছর বয়সে প্লাস্টিকস স্কেচ করে। কিন্তু চোখ জুড়ানো দেহের ভেলকিই তো জিমন্যাস্টিকসের মূল কথা নয়। তাই ১৯৫৮ সালে ও জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের অনুমোদিত কোচ নরেন গলের কাছে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকস শিখতে আরম্ভ করল। ১৯৫৯ সালে শুধু বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, পুনায় ভারতের জাতীয় জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ও পেল বিজয়িনীর সম্মান। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সালে বীম ব্যালান্স ও গ্রাউণ্ড জিমন্যাস্টিকসে একই সম্মানের পুনরাবৃত্তি।

এই সময় রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনামত রাশিয়ার জিমন্যাস্টিকস কোচ মলোভস্কি এসেছিলেন ভারতে।

তাঁর কাছ থেকে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করে আরও পটু হয়ে উঠল অরুণা। মলোভস্কি বললেন, 'রোম অলিম্পিকে মেয়েটি খুব খারাপ করবে না।' জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন রোম অলিম্পিকে অরুণাকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করলেন। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সভায় বাতিল হয়ে গেল জিমন্যাস্টিকস টীমের রোম সফর। অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করার অরুণার অরুণ আশা মলিন হয়ে গেল।

তবে আশায় বুক বেঁধে আছে এই ছোট্ট মেয়েটি। বয়স এখনো বারো পার হয়নি। সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর অনুশীলনের অফুরন্ত সময়। অতীনবাবুরও দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক পর্যন্ত জিমন্যাস্টিকসের উন্নত ছলা-কলায় আরও পটু হয়ে তাঁর মোমের পুতুল দর্শকচোখে আরও খানিকটা মোহ ছড়াতে পারবে।

দুর্জয়ের ডাক


বাণী ঘোষ (বসু)

লক্ষ্য ছিল অলিম্পিক। স্বপ্ন ছিল দূরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা। ছু'বারই সোরগোল উঠল। ছু'বারই তাল-গোল পাকিয়ে গেল।

প্রথম ১৯৩৬ সালে। বাঙালী মেয়ে যাবে বার্লিন অলিম্পিকে। খেলাধুলা মহলে কি হৈ-চৈ। কত বড় সম্মানের কথা! অলিম্পিক অঙ্গনের অঁঠাই পাথারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ঐ পনেরো বছরের ছোট্ট মেয়ে? বাঙালী মেয়ের অবলার অপবাদ বুঝি অপসারিত হয়। সবই প্রায় ঠিকঠাক। কিন্তু অর্থের অভাবে 'সেটেল্ড ফ্যাক্ট' আনসেটেল্ড হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার ১৯৩৮ সালে। সবুজ রঙের একখানা 'হাডসন টেরাপ্লেন' শহরের বুকে সগর্বে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর পেছন দিকে পোস্টার আঁটা। কি? না, "প্রফুল্ল ঘোষ ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান সুইমার অন ওয়ে টু ক্রসিং ইংলিশ চ্যানেল উইথ কুমারী বাণী ঘোষ"। ইণ্ডিয়া থেকে ফ্রান্সে চ্যানেল উপকূল পর্যন্ত তাঁদের মোটর যাত্রার পাসপোর্ট। পেছনে সুভাষ বোস থেকে আরম্ভ করে সারা বাঙলার শুভেচ্ছা। অশুভ দিনে অভিযান সুরু। তাই অযাত্রার জয়যাত্রা সফল হল না। এবারও অর্থের অভাবে ভারতের পশ্চিম

প্রান্ত থেকে গাড়ি ফিরে এল। বাঙলার সপ্ত কোটি সুসন্তানের হাতের বিজয় মালা হাতেই শুকিয়ে গেল।

তাই বলে বাণী ঘোষ কি জীবনে জয়ের মালা পাননি? পেয়েছেন, প্রচুরভাবেই পেয়েছেন। খেলাধূলায়, বিশেষ করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, অসি চালনা, যুযুৎসুর ছলাকলা আর সাঁতারের অসামান্য সাফল্যে তিনি পেয়েছেন অজস্র জয়ের মালা, সর্বত্রই সম্মানের রাশি রাশি বরন-ডালা। শুধু অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেই নয়, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা—এক কথায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায় তিনি তুলেছেন জলের বুকে কলতান। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাণী ছিলেন ভারতীয় সাঁতারের রাণী।

বাণী ঘোষের প্রথম অনুরাগ লাঠি ছুরি খেলায়। পরে সাঁতারে। যখনকার কথা বলছি বাঙলার ঘরে ঘরে তখন জাতীয় ভাবধারার বন্যা। সঙ্ঘ সমিতি গড়ে উঠছে। সভাসমিতি ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে হচ্ছে জাতীয়তার উন্মেষ। দেশনায়করা শরীর চর্চায় ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিচ্ছেন। বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতি ও পুলিন দাসের আখড়ায় চলছে দিনরাত লাঠির মহড়া। এই পরিবেশে পুতুল খেলা ফেলে লাঠি ছোরা খেলা শিখতে বাণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন উণ্মুক্ত প্রাঙ্গনে। কিম্বা বলা যায় বাণী ঘোষের বাবাই ঘরের দরজা খুলে তাঁর আদরের মেয়েকে শক্তি চর্চার পথ দেখিয়ে দিলেন।

বাবা দেবেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার কোরের মেজর। দশাসই চেহারার বিরাট পুরুষ। বিরাট গোফ, হাতে জওহরলালী বেটে লাঠি। খাকী খদ্দরের সামরিক পোষাক পরা স্বদেশী সৈনিক। সুভাষ বসুর অনুরাগী, উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী দেবেশবাবুর উৎসাহেই খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাণী ঘোষের এত প্রতিষ্ঠা।

বাণী ঘোষ গঙ্গার কুলে লালিতা পালিতা। দেবেশবাবুর

তখনকার বাড়ি ছিল কুমারটুলী অঞ্চলে। বাণী ও জগদীশ দেবেশবাবুর দুই পিঠেপিঠি সন্তান। বাণীর বয়স যখন আট নয়, আর জগদীশের পাঁচ ছয় তখন তিনি রোজ ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতেন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে। গঙ্গার উজান-ভাটিতে চলত ভাইবোনের সাঁতার শেখা। শুধু জলে না ডোবার জন্য সাঁতার। ইতিমধ্যে দেবেশবাবু বাণীকে বাগবাজার এপোলো ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছেন। সেখানেই বাণীর লাঠি ও ছোরা খেলার প্রথম হাতে খড়ি হল। পরে বাগবাজার জাতীয় সঙ্ঘে গিয়ে ভালভাবে হাত খুলল। পঞ্চু বল্লভের কাছ থেকে লাঠি, এস মিত্রের কাছ থেকে অসি এবং এস রায়ের কাছ থেকে ছোরা খেলার ছলাকলা শিখে বাণী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারের শিক্ষাও আরম্ভ হল। অ্যাথলেটিকসেও কিছুটা নাম। সাবিত্রী শিক্ষালয়ের দৌড়পটু মেয়ে হিসাবে তাঁকে সবাই চেনে।

'বাঃ, হাত পা চালানোর চমৎকার ভঙ্গি তো'। গঙ্গার ঘাটেই তাঁর উপর নজর পড়ল নলিন মালিকের। লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের ভারতীয় সাঁতারু নলিন মালিক। গঙ্গাতেই তিনি বাণীকে সাঁতারের কিছু কিছু সায়েন্স শেখালেন। কিন্তু বাবার অনুমতি পেয়ে বাণী ঘোষকে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবে এনে ভর্তি করলেন বিমল দে, বর্তমানে যিনি ঢাকুরিয়া লেকে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সাঁতার-কোচ।

১৯৩২ সালে হেদোর প্রথম প্রতিযোগিতায় বাণীর ব্যর্থতা। ৫৫ গজ ফ্রি স্টাইলে মাত্র ষষ্ঠ স্থান। কিন্তু ১৯৩৩ থেকে ব্যাক, ব্রেস্ট ও ফ্রি স্টাইলে বরাবর প্রথম। ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিতীয় স্থান। লীলা ভড়, রমা সেনগুপ্তা, নিরুপমা শীল, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, লীলা চ্যাটার্জি, ইংরেজ তরুণী লুসি ইয়াপ, সাঁতারে কেউ আর বাণীর সমকক্ষ নয়। গঙ্গার বুকে ৭ মাইল সাঁতারে ২৭ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে বাণীর দশম স্থান। কাগজে কাগজে বাণীর ছবি, বাণীর প্রশংসা।

১৯৩৫ সালে বিমল দের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব বদল। হেদোর গোল-পুকুর থেকে কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘি। বাণী ঘোষ শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের সভ্যা। এবার ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমন্ত্রণ পেয়ে এই বছর লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজের ছাত্ররা এসেছিল কলকাতায়। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে ১১০ গজ ব্যাক স্ট্রোকে বাণী ঘোষ দখল করলেন তৃতীয় স্থান। এরপর কলেজ স্কোয়ার ট্যাঙ্কে ১৬ ঘণ্টা অবস্থান। বাঙালী মেয়ের প্রথম অবিরাম সাঁতার।

রাজ্যের সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপের নাম ছিল তখন অলিম্পিক সাঁতার। বেঙ্গল অলিম্পিক ও ভারতীয় অলিম্পিকের ব্যাক, ব্রেস্ট ও ফ্রি স্টাইল, সব বিষয়েই বাণী ঘোষ প্রথম স্থান দখল করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন। এর পর কথা উঠলো বাঙালী মেয়ে বাণী যাবেন বর্লিন অলিম্পিকে।

এদিকে লাঠি ছোরা খেলায় বাণীর দেশজোড়া নাম ডাক। সভাসমিতি ও প্রদর্শনীতে তাঁর সাদর আহ্বান। চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা ও প্রদর্শনী। সেখানে বাণী ঘোষের লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসুর কলাকৌশল। এলবার্ট হলে 'মাতৃ সদনের' সাহায্যে চ্যারিঠি শো। সেখানেও বাণীর ডাক। উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বাণীর লাঠি-ছোরা-অসি খেলা। এমনি সব অনুষ্ঠানেই বাণীর ডাক, বাণীর আকর্ষণ।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এবার এই মেয়েটি সম্পর্কে উচ্চাশা। দেশনায়কদের উচ্চ প্রশংসা। প্রবর্তক, প্রবাসী, বিচিত্রা, বসুমতী, ধ্রুব, দীপালী, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, অ্যাডভান্স, এলাহাবাদের লীডার, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বাণী ঘোষ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল এবং স্যার অশোক রায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি এই মেয়েটি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা এখানে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু এক আধটি কথা তুলে দিচ্ছি।

স্যার হরিশঙ্কর বললেন—'ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন বাঙলার যুবকযুবতীর সামনে কুমারী বাণী ঘোষের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাঙলায় নারী জাগরনের সূচনা করবে।'

ডাঃ জে এন মৈত্র বললেন—'এমন মেয়ে বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। তাহলে দুর্বৃত্তগণের হাত থেকে বাঙলার মেয়েরা চিরদিন মুক্ত থাকবে,—পাশবিক অত্যাচার, পাপ আচরণ ও নারী হরণের কথা আর শুনতে হবে না।'

ভারতীয় অলিম্পিক সাঁতারের পর অমৃতবাজার পত্রিকার ২৯।১০ ৩৫ তারিখের কাগজে 'দি আন-ডিসপুটেড কুইন' শিরোনামায় তাঁর সাঁতার পটুতা সম্বন্ধে লেখা হল ঃ

THE UNDISPUTED QUEEN

In womens event Miss Bani Ghosh remains at present the undisputed queen for all India.

She has a pleasing style and although she was not pressed, Miss Ghosh revealed that she has a good deal of power behind her strokes. There was a certain rhythm in the action of her arms and her kicks did not cause the water to splash unduly and in her speed and gliding motion she had a grace all her own.

কিন্তু এতেও বাণীর মনে শান্তি নেই। অর্থ তাঁর অলিম্পিকে যাবার অন্তরায় হল। তাই বাণী ঘোষ সাঁতারবীর প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন। প্রস্তুতি হিসাবে বাঙলায় ও ভারতের নানা যায়গায় আরম্ভ হল প্রদর্শনী সাঁতার। নৈহাটি থেকে নাটোর, কটক থেকে কালিম্পং, গৌহাটি, ধুবড়ী, রাঁচি, পুরী, গয়া পাটনা, এলাহাবাদ, হায়দরাবাদ সব যায়গাতেই সফর। সব যায়গাতেই অভিনন্দন।

বাণী ঘোষ প্রফুল্ল ঘোষের কাছ থেকে ইতিমধ্যে দূর পাল্লার কষ্টসাধ্য সাঁতারের উন্নত শিক্ষায় আরও পটু হয়ে উঠেছেন। প্রফুল্ল ঘোষ, বাণী ঘোষ আর বাণীর বাবা দেবেশ ঘোষ—তিনজনের সফর। গৌহাটি পুলিস রিজার্ভ ট্যাঙ্কে প্রদর্শনী সাঁতারের পর ওখানকার জনসাধারণ আব্দার করে বসল—ও সাঁতার সাঁতার নয়। ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতার কেটে পার হতে পারলে তাকেই বলব সাঁতার। জলের মধ্যে প্রফুল্লর গা দিয়ে আগুন বেরোলো। গর্বভরে বললেন—'ব্রহ্মপুত্রকে আমি আদি গঙ্গার অতিরিক্ত মনে করি না। আমি কেন? আমার ছাত্রী বাণী ও নদী পার হবে।' কথা শুনে দেবেশবাবু তাঁর বড় গোফে মোলায়েমভাবে হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন।

খরস্রোত ব্রহ্মপুত্র। কারেণ্ট ও আণ্ডার কারেণ্ট—ভয়াবহ রূপ তার। জল হিম-শীতল। গৌহাটির উপকূলে 'উমানন্দ' পাহাড় যেখানে মাথা খাড়া করে উঠে উন্নত জলরাশিকে ছুভাগে ভাগ করে দিয়েছে সেখানকার রূপ আরও ভয়ঙ্কর। তোড়ের মুখে পড়ে ভাটির দিকে কামরূপ কামাখ্যায় চালান হবার যোগাড়। সেই ভয়ঙ্কর যায়গাতেই ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিলেন বাণী ঘোষ। কড়া হাতে দেবেশবাবু এবার গোফে তা দিলেন উপরের দিকে। সাঁতার কেটে ভয়াবহ ব্রহ্মপুত্র পার হবার এটাই প্রথম ঘটনা। এরপর আর কোন ছেলে বা মেয়ে সাঁতার কেটে ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

বাণী ঘোষরা যেখানেই যেতন সেখানেই পোস্টারে প্রফুল্ল ঘোষের চ্যালেঞ্জ থাকত—যে কেউ বাণীকে হারাতে পারবে তাঁকে একটি সোনার মেডেল দেওয়া হবে। ১৯৩৭ সালে পুরীতে এক মজার ব্যাপার ঘটল। পুরীর মহারাজা বিখ্যাত চন্দনপুকুরে এক সাঁতারের আয়োজন করলেন। উড়িষ্যার লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে গণ্য-মান্যরা সেখানে নিমন্ত্রিত। বাণী ঘোষের সঙ্গে ওখানকার সাঁতারুদের

পাল্লা। কিন্তু সাঁতার আরম্ভের সময় যাঁরা এসে পৌঁছল তাঁদের সাঁতারু না বলে সামুদ্রিক জলজীব বলাই ভাল। এলো পাঁচ ছয়জন নুলিয়া। সমুদ্রেই যাদের ঘরবাড়ী। একটি ১৫ বছরের মেয়ের সঙ্গে নুলিয়াদের প্রতিযোগিতা? লাট সাহেব ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখলেন না। লাট পত্নীও ভ্রুকুটি মেশানো চোখে চাইলেন মহারাজার দিকে। বাণী ঘোষ যখন নুলিয়াদের হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন তখন ভাবাবেগে লাটপত্নী জলে নেমে বাণীকে কোলে টেনে নিলেন। এরপর পুরীর সমুদ্র-বুকে স্বর্গদ্বার থেকে বি এন আর হোটেল পর্যন্ত ৩ মাইল সাঁতারের পাল্লায় একজন নুলিয়ার কাছে বাণী হলেন পরাজিত। সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তবু ৬ জন নুলিয়ার মধ্যে বাণীর দ্বিতীয় স্থান। সারা ভারত থেকে বহু সোনার মেডেল সংগৃহীত হয়েছিল, তার একখানা শুধু খরচ হল এখানে। ৪ খানা আবার ফিরে এল কটক মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্কে ৪০ পাক সাঁতারে জয়ের পর। তবু মন ফাঁকা। বাণীর স্বপ্ন সফল হল না।

১৯৪১ সালে বাণী ঘোষ যখন বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী তখন চাঁদপুরের জননায়ক কৈলাসচন্দ্র বসুর পুত্র হরিশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। নাম গোত্র বদলে গেল। বাণী ঘোষ এখন থেকে হলেন বাণী বসু। সৌকালীন থেকে গৌতম গোত্র। সাধনা ও স্বপ্ন সব রইল পেছনে পড়ে। এককালে যিনি লাঠি খেলায় মাটির বুকে ধূলি উড়িয়েছেন, সাঁতারে জলের বুকে তুফান তুলেছেন, তিনি এখন কল্যাণী বধু। কল্যাণী মূর্তি অবশ্য বাণী ঘোষের চিরদিনই। খেলার অঙ্গনে অশান্ত কিন্তু গৃহ প্রাঙ্গনে, স্কুল কলেজের ক্লাশে, ক্লাব চত্বরে চিরদিনই শান্ত,—শালীনতার প্রতিমূর্তি।

বাণী বসু এখন ছোট্ট সংসারের গৃহকর্ত্রী। তিনটি প্রাণীর সংসার। ক্রীড়ানুরাগী স্বামী, শাশুড়ী আর নিজে। আর একটি প্রাণীও আছে ওদের সংসারে। সেটা ইরিশ্যানাল এ্যানিম্যাল—বাণী বসুর এ্যালসে-

শিয়ান 'জিমি'। সংসারের কাজ ছাড়া বাণী বসুর অন্য কাজ এখন সমাজসেবা। রামকৃষ্ণ মিশন উইমেনস ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের তিনি একজন বিশিষ্টা কর্মী।

'স্বপ্ন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা', বাণী ঘোষের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। কিন্তু একদিন তিনি মধুর স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই বিশ একুশ বছর পরে আর এক বাঙালী মেয়ে আরতি সাহা সে স্বপ্ন সফল করেছেন। যদিও ইংলিশ চ্যানেল পার হবার প্রথম কৃতিত্ব ছিল বাণী ঘোষেরই প্রাপ্য।

খেলাপটু ডাক্তার



তপতী মিত্র

কলকাতা শহরে অনেক বড় বড় বাড়ি। কিন্তু বিরাটত্বে 'কারনানী এস্টেটের' বোধহয় জুড়ি নেই। খুঁজলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল-বঙ্গের এখানে হদিস মেলে। তা ছাড়া শ্বেতদ্বীপের শতেক অধিবাসী। সব সময় শ্বেতপীত-কৃষ্ণের কল-কাকলি। কলকাতার মধ্যে 'কারনানী এস্টেট' যেন এক খুদে কলকাতা। কে কার খোঁজ রাখে?

কিন্তু এখানকার কেউ কেউ হয়তো খোঁজ রাখত একটি ছোট মেয়ের যে হাফ রেসিং ক্লড বাটলার সাইকেল কাঁধে নিয়ে রোজ ছ তলায় উঠা-নামা করত। ওর ভার বইবার ভাব দেখে অবাকও হত অনেকে।

অবাক হয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিলেকসন বোর্ডও। ষোল বছরের এই ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়েটি ডাক্তারি পড়বে? ও আই এস সি পাশ করল কি করে?

আজও অনেকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে যখন দেখে একটি মেয়ে সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কানে 'স্টেথিস্কোপ' লাগিয়ে শিশু ও প্রসূতিদের বুক পরীক্ষা করছে,

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, ইনজেকশন দিচ্ছে, উপদেশ দিচ্ছে কি করে শরীর সুস্থ রাখতে হয়।

অনেকেই জানে না সিঙ্গুর হেলথ সেণ্টারের লেডি মেডিক্যাল অফিসার এই মেয়েটিই এক সময়ে অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাইকেল চালনা ও টেব্‌ল টেনিসে ছিল বাঙলার নম্বর ওয়ান।

জানতেন না এম বি ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কর্মকর্তারাও। কাগজে হয়তো মাঝে-সাজে ওর ছবি চোখে পড়েছে। কিন্তু কে চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখেছে ? আই এস সি সেকেণ্ড ডিভিসন এম বি কোর্সে ভর্তি হবার যোগ্যতার যথাযথ মানও নয়। কিন্তু আর কথা উঠল না যখন অ্যাডমিশন ফর্মে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা নামটি চোখের সামনে ভেসে উঠল—'তপতী মিত্র'। স্পোর্টসম্যানের আদর সর্বত্র। স্পোর্টস উত্তম্যানের তো কথাই নেই। ভর্তি হবার ডাক এল ক্যাম্বেল থেকেও। একই কারণে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হয়ে গেল ভবিষ্যতের মেডিক্যাল প্র্যাক্‌টিশনার। মেডিক্যাল কলেজ থেকেই এম বি ডিগ্রীর সঙ্গে খেলাধূলায় চ্যাম্পিয়নশিপের অনেক ডিগ্রী পেয়েছে তপতী মিত্র। লেখাপড়া ও খেলাধূলার যুগ্ম সাধনায় তপতী সত্যিই দিয়েছে প্রগতির পরিচয়। এদিক দিয়ে ওকে বাঙলার শীর্ষস্থানীয়াও বলা যেতে পারে।

খেলাধূলায় নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে তপতী সদা-সঙ্কোচ ও স্বল্পবাক। যদি কিছু ভুল হয়, যদি কিছু বেশী বলে ফেলে এই ভয়। সপ্রতিভ হয়ে বলে, "কি বা এমন করেছি যে, আমার কথা লিখতে হবে ? জীবনে কিছুই তো হল না। বিশ্ব অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করব এটাই ছিল আমার বড় আশা। সে সাধ আমার অপূর্ণই রয়ে গেল।"

উত্তরে তপতীকে বলেছিলাম, "যা করেছ বাঙলার ক'টা মেয়েই বা তা করতে পেরেছে, এখন যা করছ তাই বা কজন করতে পারছে ?"

নানা বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে খেলাধূলায় তপতীকে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে। তপতীর প্রথম অনুরাগ সাইকেল চালনায়, পরে অ্যাথলেটিকসে, শেষে টেব্‌ল টেনিসে। খুব ছোট বেলায় দেশপ্রিয় পার্কের কি একটা স্পোর্টসে ৫০ মিটার দৌড়ে তপতী প্রথম হয়েছিল, তা ভাল করে মনে নেই। তপতীর দুই আলমারি-ঠাসা পুরস্কারের মধ্যে সেইটিই প্রথম। কিন্তু তারপরে কিছুদিনের জন্য ছেদ। সাইক্লিং ও স্পোর্টসের অনুশীলন আরম্ভ হয় বেশ একটু দেরিতে। তপতী তখন বেলতলা গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। খেলাধূলায় অনুরাগ থাকায় এর মধ্যে সে সেণ্ট জেমস স্কোয়ারে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী সভ্য হয়ে বসেছে। বেনেপুকুর অঞ্চলের বাড়ি থেকে ওখানেই ও রোজ যেত স্পোর্টসের প্র্যাক্‌টিস করতে। নবীন সেন ছিলেন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। মেয়েটি সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ দেখালেন। ক্রীক রোতে তাঁর বাড়ির রাস্তায় ওকে সাইকেল চড়াতে শুরু করলেন। স্কুলের ক্লাস নাইনে থাকা সময়েই সাইকেল ও অ্যাথলেটিকসের কিছু কিছু পুরস্কার এল তপতীর হাতে।

১৯৪৫-এ ক্লাস টেনে প্রোমোশনের সঙ্গে খেলাধূলোয়ও প্রোমোশন। এবার স্কুলের ওপেন ইভেণ্ট পনেরোশো মিটার সাইকেলে প্রথম। এর পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাঙলার সাইকেলে কখনই সে দ্বিতীয় হয়নি, শুধু একবার ছাড়া। কি একটা স্পোর্টসে তাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবু সে প্রতিযোগিতা শেষ করেছিল। কিন্তু উঁচুতে স্থান ছিল না।

একটু আগে বলছিলাম না, নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তপতীকে স্পোর্টসে জায়গা করে নিতে হয়েছে। স্পোর্টসে তখন চটপটে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আধিপত্য। ইস্থার লীলা, স্মিথ, বেলগার্ড, ডালসি বিকদের মধ্যে চিত্রা, পদ্মা, নীলিমা, তপতীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পিছু হটে যাচ্ছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

মেয়েরা। সুতরাং সাইকেল স্পোর্টসে ওরা আর নাম দেয় না। প্রতিযোগিতা বাতিল হবার যোগাড়। কারণ কোন বিষয়ে প্রতি-যোগিতা চালাতে হলে অন্তত তিনটি মেয়ে চাই। তাই তপতীর সাইকেল রেসের জন্য অনেক স্পোর্টসে নীলিমা ঘোষ এবং পদ্মা দত্তকেও নাম দিতে হয়েছে। বহু স্পোর্টসে তপতীকে পাল্লা টানতে হয়েছে প্রায় এককভাবে। ফলে 'সময়' ভাল হয়নি। সময় ভাল না হবার দ্বিতীয় কারণ তার হাফ রেসিং ক্লড বাটলার সাইকেল ওজনে একটু ভারী। ১৫ সের। রেসিং সাইকেল আরও একটু হাল্কা হয়, হাওয়ার সঙ্গে উড়ে চলে।

যাই হোক, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সাইকেলে তপতীর জুড়ি মেলেনি। অ্যাথলেটিসেও প্রায় সমপটুতা। প্রথমদিকে দৌড়ে নীলিমা ঘোষকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছে এই মেয়েটির কাছে। পরে নীলিমা এগিয়ে গেল। ও পড়ল সাইকেল নিয়ে। তবু স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার সময় দু' বছরই ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৯৫৯-এ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী অবস্থায় আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে সর্বশ্রেষ্ঠা স্পোর্টস উত্তম্যানের সম্মান। এ বছর বঙ্গদেশপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নামাঙ্কিত পদকের সঙ্গে যে সার্টি-ফিকেট তপতার হাতে এল তাতে লেখা ছিল ঃ

১৫০০ মিটার সাইকেল রেস—প্রথম

১০০ মিটার দৌড়—প্রথম

৮০ মিটার লো হার্ডলস—প্রথম

রানিং ব্রড জাম্প—দ্বিতীয়

পরের বছর বঙ্গদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর পদকও হাতে এল তপতীর। কিন্তু তপতী বলে এ বছর সে চ্যাম্পিয়নশিপ পায়নি। কেন যে গভর্নরস্ মেডেল তাকে দেওয়া হল সে জানে না। যাই হোক, 'কারনানী এস্টেটে' তপতীর রাশি রাশি কাপ মেডেলের মধ্যে দুই বঙ্গদেশপালের দু'টি মেডেল মাথা উঁচু করে আছে।

মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়ই স্পোর্টস নিয়ে তপতী পড়ল এক মুশকিলে। বিশারদরা বললেন—ছু'টো হবে না। হয় তোমাকে সাইকেল ছাড়তে হবে, না হয় অ্যাথলেটিকস। কারণ যাঁরা সাইকেল চালায় তাঁদের 'থাই মাস্‌ল' ভারী হয়ে পড়ে। ওটা এ্যাথলেটিকসে উন্নতির পরিপন্থি।

তপতীর বড় সাধ অলিম্পিকে যাওয়া। সুতরাং সাইকেলকেই সে আঁকড়ে ধরে রইল। কিন্তু তার জানা ছিল না অলিম্পিকের সাইকেল রেসে মেয়েদের ইভেন্ট নেই। যখন জানল, ভীষণ আঘাত পেল মনে। আঘাত পেল দেহেও। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েলস গ্রাউণ্ডে কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস। ৭৫ মিটার দৌড়ে সকলকে অনেক পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। শেষ সীমা পার হবার পর দৌড়ের টাল সামলানোর জায়গা পেল না। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সজোরে গতিবেগ সামলাতেই তার পা ঘুরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল দীনেশ চক্রবর্তী তাকে আর দৌড়তে বারণ করলেন। কিন্তু বারণ শুনল না তপতী। কারণ স্পোর্টসের নেশায় সে পাগল। খোঁড়া পায়ে খোঁড়াদের দৌড়ে, মানে ক্যাঙ্গারু রেসেও সে স্থান পেল। তপতী এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, হাঁটুতে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। কিছুদিন পরে রোগ ধরা পড়ল। 'মেডিয়াল সেমিলুনার কার্টিলেজ অব দি রাইট নী জয়েন্ট।' ১৯৫০ সালে হাঁটু অপারেশন করলেন মেডিক্যাল কলেজের সার্জন প্রভাত সান্যাল। সাইকেল জীবনে তপতীকে এখানেই ইতি টানতে হ'ল।

এবার টেব্‌ল টেনিস। পড়ার সঙ্গে ওখানকার কমন রুমেই পাঠ আরম্ভ। ১৯৫৪ সালে ফাইন্যালে ইস্থার মোজেসকে হারিয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। জাতীয় অ্যাথলেটিকস ও সাইকেলে বাঙলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগের মত গুণ্টুর, শাহরনপুর, হায়দরাবাদ, এমন কি কলম্বোতেও জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে বাঙলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ। ১৯৫৪ সালে তপতী ছিল বাঙলার টেব্‌ল

টেনিসে এক নম্বর মেয়ে, পরে দুই নম্বর, খেলা ছাড়ার সময় ছিল তিন নম্বর।

তপতীর টেব্‌ল টেনিসের গ্রিপ একটু ডিফেক্‌টিভ। না পেনহোল্ড, না শেকহ্যাণ্ড। টেব্‌ল টেনিসের গুরুজী ভিক্টর বার্না তাঁর হাতের মা'র দেখে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রিপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তার হয়ে ওঠেনি।

হ্যাঁ, সাইকেল চালনায় বাঙলার স্পোর্টসে তপতীর তো একাধিপত্য ছিলই—ভারতেও তখন তার বেশী জুড়ি ছিল না। শুধু বোম্বের পার্শী মেয়ে দীনু দারখানওয়ালার সঙ্গেই তপতী পেরে উঠতো না। ভারতীয় সাইকেলে তপতী ছিল দুই নম্বর মেয়ে।

খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির দিক দিয়েও তপতীর জুড়ি কম। খেলার তালিকা রচনা, দিন তারিখ এবং সময় সম্বন্ধে কোন দিন প্রতিবাদ করতে দেখিনি এই মেয়েটিকে। টেব্‌ল টেনিসের সব প্রতিযোগিতাতেই তার খেলা চাই। সিঙ্গুর থেকে ট্রেনে করে এসে খেলায় যোগ দিয়েছে, হারজিৎ যাই হোক তাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে আবার রাত্রির ট্রেনে সিঙ্গুর যাত্রা করেছে। খেলার তারিখ নিয়ে 'আজ না কাল,' সময় নিয়ে—'এখন না তখন,' খেলা নিয়ে—'এর সঙ্গে না ওর সঙ্গে'—এমন ছিচকাঁদুনেপনার পরিচয় কেউ পায়নি তপতীর দীর্ঘদিনের ক্রীড়া-জীবনে।

একবার চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে কি একটা প্রতিযোগিতা। ঊষা সুন্দর রাজের সঙ্গে তপতীর খেলা। ভারতের দুই নম্বর টেব্‌ল টেনিস পটিয়সী ঊষা সুন্দর রাজ। তপতীর হার অনিবার্য।

খেলা আরম্ভের একটু পরেই ঊষার নাক মুখ দিয়ে কি কারণে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। তার বিশ্রামের জন্য খেলা সাময়িক বন্ধ রইল। আবার খেলা আরম্ভ হতে আবার রক্ত। আর বিশ্রাম দেওয়ার নিয়ম নেই। ঐ অবস্থায় ঊষা না খেললে আইনমত তপতীর বিজয়িণীর সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু বিজয়িনী হতে চাইল না

বাঙলার ক্রীড়া-মনা মেয়েটি। তপতীর ইচ্ছা এবং অনুরোধেই সেদিন খেলা স্থগিত রাখা হল। পরের দিন উষা সুন্দর রাজের কাছে হেরে গেল তপতী। এমন গৌরবজনক হার কি জেতার গৌরবের নীচে স্থান পায়? এই খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি, এই স্পোর্টস-ম্যান স্পিরিট ক'জনের মধ্যে আছে?

তপতীদের পৈতৃক বাড়ি ছিল খুলনা জেলার মিকশিমিল গ্রামে। বাবা সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ইংরেজীর অধ্যাপনা করেছেন। মা নীহার মিত্র ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। ওখান থেকেই তিনি আই এ, বি এ পাশ করেছেন। 'তপতী'র নামের একটু ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস খুবই গর্বের। তপতী পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করবার আগে তপতীর অভিনয়ে মা নীহার মিত্রের 'বিপাশা' ও 'গৌরী'র ভূমিকা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগে। তপতী হবার পর গুরুদেবই তার নাম রাখেন 'তপতী'।

মায়ের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাই খেলা-ধূলোয় তপতীর সাফল্যের সোপান।

সাঁতারুর সহধর্মিণী


ইলা ঘোষ

ইলেকট্রিক সঙ্কটের মধ্যেও বিজলী বাতির সমারোহ। কিন্তু প্রকৃতির কাছে সে আলোও যেন হার মেনেছে। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গে' আলো উছলে পড়েছে সমস্ত আজাদ হিন্দ বাগে।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, রাত প্রায় ১টা। জলের উপর ভাসমান এক নারী মূর্তি। এক প্রৌঢ় পুরুষ উদ্‌ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে ১২ বছরের এক ছোট্ট ছেলে। জলের চারিদিকে রেলিং ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রহাকুল হাজার হাজার দর্শক।

এতক্ষণে বুঝতে বাকী নেই সাঁতারপটিয়সী ইলা ঘোষ হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ব্রতী হয়েছেন ২৫ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতারের কষ্টসাধ্য সাধনায়। কলকাতার নবনির্বাচিত মেয়র শ্রীরাজেন মজুমদারের সঙ্কেত পেয়ে জলে নেমেছেন সেই বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে, জল থেকে উঠবার কথা পরের দিন সন্ধ্যায়, ব্রত পূরণের পর। উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষ ইলা ঘোষের সন্তরণবীর স্বামী প্রফুল্ল ঘোষ। আর ১২ বছরের ছেলেটি নিঃসন্তান জননীর নয়নের মণি। নাম দেবু।

বলা বাহুল্য, ইলা ঘোষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং হাত বাঁধা অবস্থায় ২৫ ঘণ্টা সাঁতার কেটে মেয়েদের সাঁতারে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন রেকর্ড। কারণ বিশ্বে কোথাও হাত বেঁধে এভাবে সাঁতার কাটার রেওয়াজ নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর কোন মেয়ের পক্ষে শুধু সাঁতারের জন্য এত বেশী সময় জলে থাকার নজীরও বিরল। তাই ইলা ঘোষের এ কৃতিত্ব সাঁতার-জগতের স্মরণীয় কীর্তি হিসেবেই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

আজাদ হিন্দ বাগের বুকে বিয়াল্লিশ বছরের বর্ষীয়সী বধূ ইলা ঘোষের ভাসমান দেহকে দেখে মনে হয়েছিল কে যেন জলের উপর সাধনায় শায়িত। যেন ধ্যানমগ্না। সাঁতারের ভাষায় ওর নাম 'ফ্লোটিং'। ফ্লোটিং অর্থাৎ জলের উপর ভেসে থাকার বিদ্যা। এমন বিদ্যা ভারতের কোন মেয়ের কেন, কোন পুরুষেরও নাকি অধিগত নয়। বিছানার উপর শোবার মত যেন জলের উপর শুয়ে আছেন। সত্যি দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক দৃশ্য।

যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী।

সহধর্মিণীই বটে। দু'জনেই সাঁতারের সাধনা করে চলেছেন। সাঁতারই দু'জনের নেশা ও পেশা, অবশ্য গৃহস্থালীর সঙ্গে। বিয়ের আগে ইলা ঘোষের সাঁতারে তেমন আগ্রহ ছিল না। ছোট বেলায় সেই কবে ঢাকার জোলসীন গ্রামে সাঁতার কেটেছেন ভাল করে মনে নেই। বুড়িগঙ্গা থেকে একটা নদী বেরিয়ে গিয়েছিল তাঁদের গ্রামের বাড়ি ছুঁয়ে। বাবা পঞ্চানন দাসের বকুনির ফাঁকে ফাঁকে সেই নদী-তেই তার সাঁতারের হাতেখড়ি। তারপর জীবনের ঘূর্ণিপাকে মামার সঙ্গে এলেন কলকাতায়। মামা ছিলেন সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই সূত্রেই প্রফুল্লর সঙ্গে জানাজানি। জানাজানি থেকে শেষে অর্ধাঙ্গিনী। প্রকৃত অর্থে সহধর্মিণী।

তারপর সাঁতারের আরাধনা। স্বামীর প্রেরণা আর স্ত্রীর সাধনা। যুগ্ম প্রচেষ্টায় অল্পদিনে অনেক শিক্ষার অধিকারিণী। স্বামী-স্ত্রী মিলে

বাঙ্গলার ও ভারতের নানা স্থানে সাঁতারের প্রদর্শনী। হাত-পা বেঁধে সাঁতার, স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম সাঁতারের মধ্যে 'নেতাজী বোর্ড', 'প্রপেলিং', 'পদ্মাসন', 'জগন্নাথ সুইমিং' প্রভৃতি নানা ধরণের সাঁতারে দর্শকদের মনোরঞ্জন, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও উপার্জন। শুনলে আশ্চর্য লাগে কুড়ি বছরে স্বামী-স্ত্রী মিলে ভারতের প্রায় ন'শো জায়গায় সাঁতারের নানা কসরত দেখিয়েছেন। বাহবা পেয়েছেন বহু দর্শকের কাছ থেকে। আর প্রদর্শনী সাঁতার থেকে তাদের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক লাখ টাকা। সাঁতারপটু এক দম্পতির পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে অবশ্য দম্পতির অভাব নেই। তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষরও আছে সারা বিশ্বে। অ্যাথলেটিকসে জ্যাটোপেক দম্পতি এমিল ও ডানা—হ্যারোল্ড কনোলী ও ওগলা ফিকোটোভার বিশ্বজোড়া নামডাক। সাঁতারে কাটালিন জোকে ও কালম্যান মার্কোভিচ—ডেসজো গ্যারমাটি ও ইভা জেকেলী, সারা জগতে সুপরিচিত।

প্রফুল্ল ও ইলা ঘোষ অবশ্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তবু স্বামী প্রফুল্ল ছিলেন সাঁতারক্ষেত্রে এক সময়ে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। যার জন্য বড়লাট আরউইনের কাছ থেকে পেয়েছেন পুরস্কার। আর আশীর্বাণী পেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যার আশুতোষ, নেতাজী সুভাষের কাছ থেকে।

কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়ে। স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে স্বামীর কথা কিছু না বললে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ 'তোমার মাঝে আমার প্রকাশের' মত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর নৈপুণ্যের প্রকাশ। তাই বোধ করি এদের দাম্পত্যজীবন আরও মধুর।

বাঙ্গলার মনীষীরা সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদরসম। সাঁতারের প্রতি ছিল সত্যেন দত্তর যথেষ্ট আগ্রহ। নিজে হেদোর জলে শুধু

সাঁতারই কাটতেন না, তাঁর অমূল্য সময়ের বহুক্ষণই কাটতো এখানে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানের ছন্দে লেখা জলচর ক্লাবের জলসা-রঙ্গ নামে কবিতায় তিনি লিখে গেছেন—

'রঙবেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁঝির জালে ঘেরা!
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাৎলা-চিতল-কাঁকড়া-কাছিম
ব্যাঙের বিহারভূমি'

এই কবিতারই শেষ দিকে সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

'এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
প্রফুল্ল, দুই জিতেন হুল্লুর
হুল্লোড়েরি ভূমি।'

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে কবি সত্যেন দত্ত নিজেও হৈ-হুল্লোড় কম করেননি। সত্যেন দত্তর হাত ধরেই প্রফুল্ল গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সাঁতারের কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহও পড়েছিল প্রফুল্লর উপর। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে এর কিছু আভাসও আছে।

ইলা ঘোষের সাঁতারু স্বামী প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্বের কথা কারোই

অজানা নেই। উঠতি বয়সে প্রফুল্লর কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। হেদোয় তাঁর ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট এবং রেঙ্গুনের রয়াল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সাঁতার, আবার হাত-বাঁধা অবস্থায় হেদোয় ৭১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট একটানা সাঁতার আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্ত্রী ইলা ঘোষও স্বামীর সাথে তাল রেখে চলেছেন। ১৯৪২ সালে দমদমের এক পুকুরে তিনি যেদিন সাঁতারের প্রথম 'ডেমনস্ট্রেশন' দেখিয়েছিলেন, সেদিন সভানেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বলেছিলেন 'তুমি আমাদের মুখ রাখবে'। ১৯৫৪ সালে জামসেদপুরে হাত বেঁধে ১৪ ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর টাটা কোম্পানীর অন্যতম মুরুব্বি ফিরোজ কুঠার বলেছিলেন—'আপনি সাঁতারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।'

ইলা ঘোষের এবারকার কৃতিত্ব সে ঔজ্জ্বল্যকেও ম্লান করে দিয়েছে, নতুন কৃতিত্বে তাঁর মুখ হয়েছে আরও উজ্জ্বল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার বউ এবং মেয়েদেরও।

'বুক ভরা মধু বাঙলার বধূ নয়নে নীরব ভাষা' সাঁতারনিপুণা ইলা ঘোষও নদীমাতৃক বাঙলার বউ। হাতা খুন্তি বেড়ি ধরে দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থা করছেন, হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাঁতার কেটে সৃষ্টি করেছেন নতুন রেকর্ড। আবার স্নেহমমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে চিরদিনের জন্য কোলে তুলে নিয়েছেন এক কচি ছেলে। যার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্বন্ধ নেই।

আর একটা কথা—২০ বছরের বিবাহিত জীবনে ইলা ঘোষের জন্য প্রফুল্ল ঘোষকে কোন-দিন ডাক্তার ডাকতে হয়নি, ওষুধও কিনতে হয়নি। সাঁতারে সুপটু দেহ—সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী সাঁতার-পটিয়সী ইলা ঘোষ।

অ্যাথলেটিকসে অনন্যা



নীলিমা ঘোষ

'শুধু স্মৃতিটুকু পড়ে আছে সে এখানে নেই।'

সব ফেলে রেখে সে চলে গেছে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। খ্যাতি যশ মান, মায়ের স্নেহ, দেশবাসীর ভালবাসা, কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আলমারি-ভরা কাপ মেডেল, বাক্স-ভর্তি সার্টিফিকেট, ঘর-বোঝাই সাজ-সরঞ্জাম—রানিং শু, ট্র্যাক স্যুট, দৌড়-লাফঝাঁপের আরো কত কি সরঞ্জাম। সব পড়ে রয়েছে পার্শীবাগান অঞ্চলের কালিদাস সিংহ লেনের পুরনো বাড়িতে, কিছু কিছু বেহালার নতুন আলয়ে। কিন্তু যার জিনিস সে এখানে নেই। বাংলা তথা ভারতের খ্যাতনাম্নী মেয়ে এখন পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গের ঘরনী। নীলিমা ঘোষ এখন নীলিমা ভিক। কূর্ট ভিকের সহধর্মিণী।

অথচ এখানেই গড়ে উঠেছিল নীলিমার যশের তাজমহল।

অ্যাথলেটিকসে এমন মেয়ে কটা মেলে? বাংলায় তো আর একটিও নেই। গুনলে সারা ভারতেও বেশী পাওয়া যাবে না।

ছোটবেলায় অ্যাথলেটিকসে হাতেখড়ি হৃষীকেশ পার্কের বালিকা ব্যায়াম সঙ্ঘে। তারপর পার্ক পেরিয়ে বড় মাঠে। ১৯৪৮ থেকে সুনাম আহরণ। ১৯৪৯-এ ইস্থার লীলার পশ্চাৎধাবন। দৌড়পটু অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে লীলা সে বছর সব স্পোর্টসে প্রথম।

নীলিমা দ্বিতীয়। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উচ্চে আরোহণ। এ বছর থেকেই জাতীয় অ্যাথলেটিকসে নীলিমার নিয়মিতভাবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব। ১৯৫২ সাল থেকে মেয়ে টিমের অধিনায়িকা। ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমে ভারতের প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক টিমের অন্যতমা। অলিম্পিক অঙ্গনে প্রথম বাঙালী মেয়ে। অবশ্য আরতি সাহাও অন্যতমা। সাঁতারে আরতি, অ্যাথলেটিকসে নীলিমা। বিশ্ব ক্রীড়া-সভায় প্রথম দুই বাঙালী ললনা! অলিম্পিকের অ-ঠাঁই পাথারে নীলিমা অবশ্য ঠাঁই পায়নি। ভারতের কেই বা পেয়েছে? এমনি যে কীর্তিমান মিলখা সিং সেও তো ডুবে গেছে। আর নীলিমা তো সে দেশেরই নারীজাতির প্রতিনিধি।

তবু ভাবতে আনন্দে বুক ভরে ওঠে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসে নীলিমা কতখানি বাড়িয়াছে বাঙ্গলার সুনাম। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত মেয়েদের স্পোর্টসে এই নামটি ঘুরেছে সবার মুখে। নানা স্পোর্টসে রাশি রাশি পুরষ্কার। একার কৃতিত্বে সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাবের জন্য বছর বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। রাজ্য রেকর্ডের ভাঙ্গাগড়া। গলায় বছর বছর রাজ্যপালের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিনীর পুরষ্কার। সর্ব ভারতীয় অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়ের সর্বপ্রথম পুরষ্কার লাভ, সর্বপ্রথম প্রথম স্থান, সর্বপ্রথম ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করার কৃতিত্ব।

বাঙালী মেয়ে কেন? সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিকসে বাঙলার ক'জন পুরুষই বা প্রথম স্থান পেয়েছেন? আট নয় জনের বেশী নয়। বোধ হয় হাই জাম্পে আবু ইউসুফ আর কমল চ্যাটার্জি, পোলভল্টে ডি কে চৌধুরী, এস চক্রবর্তী আর আনন্দ মুখার্জী, হার্ডলসে এইচ কে দত্ত, ভ্রমনে বি দাস, এ কে দত্ত ও সুবোধ সিংহ। ব্যাস্ শেষ হয়ে গেল অ্যাথলেটিকসে বাঙালীর কৃতিত্বের নিদর্শন। ১৯২৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত

দীর্ঘ ৩৭ বছরে বাঙালী পুরুষ অ্যাথলেটদের এইটুকুই প্রাধান্যের পরিচয়।

আর বাঙলার মেয়ে নীলিমা ১৯৪৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নয় বছর ধরে প্রতি বছরই জাতীয় অ্যাথলেটিকসের অঙ্গন থেকে পুরস্কার সংগ্রহ করেছে। লখনৌ, লুধিয়ানা, দিল্লী, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, জব্বলপুর, পাতিয়ালা সব জায়গাতেই ওর কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমের হার্ডলস পারের পর ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ৮০ মিটার হার্ডল রেসে প্রথম স্থান দখল করার ফলেই ওর হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ঘটে। দৌড় পটিয়সী হিসাবেও নীলিমার তখন জুড়ি কম। হার্ডলসে নীলিমার সময় ছিল ১৩.১ সেকেণ্ড। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ও অনেক ভাল করেছিল। সময় হয়েছিল ১২.৯ সেকেণ্ড। তবু বিশ্বের সেরা সেরা মেয়েদের সঙ্গে প্রারম্ভিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অর্থাৎ দ্বিতীয় হিটে পঞ্চম স্থান। ১০০ মিটার দৌড়েও প্রথম হিটে পঞ্চম। সময় ১৩.৬ সেকেণ্ড। তবু আবার ভাবতেও গর্ববোধ করছি, অলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডলসে নীলিমার ১২.৯ সেকেণ্ড ভারতীয় হিসাবে তখনকার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিনা কারনেই কি অ্যাথলেটিকসে অনন্যা নীলিমা।

শুধু কি অ্যাথলেটিকস? ব্যাডমিণ্টনেও নীলিমার কৃতিত্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে অনেকবারের প্রতিনিধি। রাজ্য ব্যাডমিণ্টনে একাধিকবার প্রতিযোগিতা, ছোট বড় প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীর জয়মাল্য। অ্যাথলেটিকসের নানা বিষয়েই নিপুন ছিল নীলিমা। প্রথম নাম দৌড়ে, পরে হার্ডলসে, তারপর জ্যাভেলিন ও ডিসকাসে। স্পোর্টসকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল এই মেয়েটি। অনলস অনুশীলন, অফুরন্ত অধ্যব্যসায়, আর বিরামহীন সাধনাই তার সাফল্যের সোপান।

মানব দেহধারী 'বাষ্পীয় ইঞ্জিন' এমিল জ্যাটোপেক, তার সহধর্মিনী জ্যাভেলিন ছোঁড়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ডানা জ্যাটোপেকোভা, পোলভল্টের অলিম্পিক বিজয়ী বব্ রিচার্ড, ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন বব্ ম্যাথিয়াস প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত অ্যাথলেটরা যখনই শুভেচ্ছা সফরে কলকাতায় এসেছেন তখনই দেখেছি নীলিমা ছায়ার মত তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিখে নিতে চেষ্টা করছে অল্প সময়ে অ্যাথলেটিকসের যতটুকু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শিখে নেওয়া যায়।

অলিম্পিকের আগে কলিকাতায় হার্ডলস প্র্যাক্টিস করার অসুবিধা ছিল। রোজ ভোরে উঠে নীলিমা যায় পানিহাটির মাঠে প্র্যাক্টিস করতে। পায়ে রানিং স্যু, পরনে ছোট প্যান্ট, গায়ে তোলা কাটা জামা, সমস্ত দেহে শক্তির আভা। নীলিমা তখন অ্যাথলেটিকসের নেশায় মাতাল। হার্ডল রেসের অনতিউচ্চ কাঠের ফ্রেম সাজানো আর দৌড়ের আসন পাতা মাঠে তার রোজকার অভিসার।

নীলিমা সত্যিই নীলিমা। নীলিমায় নীলও বলা যায়। কোঁকড়া চুলের এই কালো মেয়েটিকে দেখলে মনে হত যেন কোনো গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের প্রতিমূর্তি। অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে এক সৌন্দর্যের ছবি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারিণী।

কূর্ট ভিকের সঙ্গে নীলিমার বিয়ের ব্যাপারটা অনেকের কাছে অজানা রয়ে গেছে। প্রথম পরিচয় বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক মিলন-কেন্দ্রে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের আগে কোপেনহেগেনের অ্যাথলেটিক ক্যাম্প। ভারতীয় দলে নীলিমা। কূর্ট ভিক পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল দলে। সৌজন্যসূচক মৌখিক আলাপ। ক্ষণিকের পরিচয়। কিন্তু ওই অল্প সময়ের আলাপে 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' যে কাঞ্চনবরণ কূর্টের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দেবে তা নীলিমারও জানা ছিল না। দু'জনার দুটি পথ দুই দিকে বেঁকে গেল। ৪ বছর পরে আবার পথ এসে মিশল সেই দেশে যে দেশ কত অজানারে জানিয়েছে প্রীতি, কতজনকে ঠাঁই দিয়েছে—কত দূরকে করেছে নিকট বন্ধু।

কলকাতার কূলে এসে ভিড়ল কূর্টের সোনার তরী। পরিচয়হীন অজানা শহর। জাহাজের কাজের ফাঁকে এখানে ওখানে আনাগোনা। তারপর দেখা স্বপ্নলোকের সঙ্গীনির সঙ্গে। কূর্টকে বিমুখ করা নীলিমার পক্ষে সম্ভব হল না। বাঙালীর সঙ্গে বিদেশীর বিয়েতে শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি পড়ল না, সানাই পোঁ ধরল না। ১৯৫৬ সালের এক শুভলগ্নে কলকাতার জার্মান কনস্যুলেটে নীলিমার সঙ্গে কূর্ট ভিকের রেজেস্ট্রি-বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিয়ের পরও বছর দুই নীলিমা ছিল কলকাতায় তার কীর্তির স্মৃতি বুকে নিয়ে। এর মধ্যে পথচলার প্রয়োজনে তাকে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে। কখনো 'নেস্‌লসের' লেডি রিপ্রেজেণ্টেটিভ, কখনো সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দপ্তরের কর্মী।

তারপর কিছুটা অভিমান বুকে নিয়েই নীলিমা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অভিমানের কারণও আছে। অ্যাথলেটিকসে যে বাঙলাকে সে দিয়েছে অভাবনীয় সম্মান তার যাবার সময় সেই বাঙলার অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন বা অলিম্পিক এসোসিয়েশন দু'টো মিষ্টি কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়নি, যে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের জন্য সে বছর বছর চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব বয়ে এনেছে সে সিটি ক্লাব কোন সম্বর্ধনা জানায়নি, বাঙলার ব্যাডমিণ্টন সংস্থাও জানায়নি বিদায় অভিনন্দন।

হামবুর্গে নীলিমা এখন এক নবকুমারের মা। তবে খেলার নেশা এখনো কাটেনি। কাটবে কি করে? খেলাধূলার সঙ্গেই যে তার প্রথম প্রণয়। হামবুর্গের ব্যাডমিণ্টন কোর্টে নীলিমা অন্যতম আকর্ষণ, সাদার দেশে কালো মেয়ের খুবই নাম ডাক।

ইস্পাতের মেয়ে



ইলা সেন (মিত্র)

নেশা—খেলাধুলা, লেখাপড়া, সঙ্গীত, অভিনয়, পেশা—অধ্যাপনা ও গৃহস্থালী, ধর্ম—রাজনীতি।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বিভব-দৈন্য, সংগ্রাম ও সংগঠনের বিচিত্র জীবন। দুঃসাহসী বীরাঙ্গনা মেয়ে। কুমারী জীবনে ইলা সেন নামে কলকাতার খেলাধুলায় প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারিণী প্রথম বাঙালী মেয়ে। বিবাহিত জীবনের 'ইলা মিত্র' পাক সরকারের ফাঁসির আসামী। নির্মম অত্যাচারে নিপীড়িতা কিন্তু অদম্য মনের জোর আর অসম সাহসিকতার পরিচয়ে বিশ্বখ্যাতি। লেখকের লেখার আলেখ্য। কবির কাব্যের বাস্তব উপাদান।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। পাথরে খোদাই করা কালো দেহ। কিন্তু সারা অঙ্গে আগুনের ফুলঝুরি।

না, ভুল বলেছি। পাথর নয়। ইস্পাতে গড়া শরীর। না হলে শীর্ণ দেহে এত শক্তি আসে কোথা থেকে? পাথরও ভেঙ্গে যায়। ইস্পাতে আঘাত করলে বেরোয় আগুনের ফুলকি।

পাকিস্তান সরকার ভালভাবেই তার প্রমাণ পেয়েছে। বেটন, বেয়নেট ও বন্দুক পেটা করে তারা কলকাতার স্পোর্টস করা মেয়ে

ইলা মিত্রকে আধমরা করেছে, কিন্তু একেবারে মেরে ফেলতে পারেনি। একবার তো কলকাতার কাগজে কাগজে খবর বেরিয়েছিল পুলিসের অত্যাচারে পাকিস্তান জেলে ইলা মিত্র মারা গেছেন। বিদেশের কাগজেও তাঁর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে কম সোরগোল ওঠেনি। কিন্তু ইস্পাতের মেয়ে ইলা মিত্র মরেনি। ফাঁসির আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশও নাকচ করেছেন। এখন তিনি সিটি কলেজের বাঙলার অধ্যাপিকা কলেজের স্পোর্টস সেকশনের সেক্রেটারী।

যশোরের মেয়ে। আদি বাড়ি ছিল ঝিনেদার বাঘুটে গ্রামে। কিন্তু নিজের পল্লীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটেনি। কলকাতাতেই জন্ম। শিক্ষাদিক্ষাও এখানে।

বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন প্রথমে ছিলেন এ জি বেঙ্গলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পরে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। এখন অবসর জীবন।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। নগেনবাবু যখন কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কানাই ধর লেনে বাস করতেন, তখন ইলা সেনের খেলাধুলা ও সাঁতারে হাতেখড়ি।

বাবা নিজে খেলাধূলা বিশেষ করেন নি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় পটু করতে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন হেয়ার স্কুলের মাঠে দৌড় করাতে। সেখান থেকে কলেজ স্কোয়ারে সাঁতারের জন্য। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটত।

তিন বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে ইলা সেন সবের বড়। ভাইয়ের মধ্যে বড় নৃপেন সেন, যিনি এম.ডি পাস করবার পর শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে এখন প্যাথোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন। এই দু'জন ছাড়া ভাইবোনেদের মধ্যে আর কেউ অবশ্য খেলাধূলায় নাম করতে পরেন নি। নৃপেন সেনের সুনামও সুবিস্তৃত নয়। কিন্তু

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মেয়েদের খেলাধূলায় 'ইলা সেন' ছিল উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু অ্যাথলেটিক স্পোর্টসেই নয়, বাস্কেটবল, ব্যাডমিণ্টন এবং টেনিকোয়েটে সমান প্রতিষ্ঠা।

বেথুন স্কুলের ছাত্রী, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চিলড্রেন্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভ্যা। দু' জায়গাতেই দৌড়পটু মেয়ে হিসাবে ইলা সেনের কদর। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত জুনিয়র অ্যাথলীট হিসেবে দু'হাত ভরে পুরস্কার সংগ্রহ। আন্তঃস্কুল স্পোর্টস, উইমেনস অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, জাতীয় যুব সঙ্ঘ স্পোর্টস, বেঙ্গল অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সিটি ক্লাব স্পোর্টস, মোহনবাগান স্পোর্টস, আনন্দ মেলা, শক্তি সঙ্ঘ স্পোর্টস্, ক্রাউন স্পোর্টস, ক্যালকাটা অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রভৃতি সব স্পোর্টসেই দৌড়, স্যাক রেস, স্কিপিং রেস, অরেঞ্জ রেসে ইলা সেনের প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান ; প্রায় সব জায়গাতেই চ্যাম্পিয়নশিপ। এর মধ্যে রেকর্ড ভাঙ্গাগড়ার কৃতিত্বও আছে। বাঙ্গালী মেয়ের নয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বারবারা এডওয়ার্ডের ৫০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ১৯৩৭ সালে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ইলা সেন।

১৯৩৯ সালে সিনিয়র অ্যাথলীট হিসাবে প্রমোশন এবং পরের বছর প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসেবে ইলা সেনের ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাঙালার প্রতিনিধিত্ব। এর আগে বারবারা বিক, লোলা সিভিল, এডনা জনসন, এল ক্যারু, ডরোথী বেলগার্ড প্রভৃতি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। চিরাচরিতের বাঁধ ভাঙ্গলেন ইলা সেন। বাঙলার শ্বেতকায় মহিলা অ্যাথলীট দলে একমাত্র কালো মেয়ে।

তখন কাগজে কাগজে ইলা সেনের দৌড়ের ছবি। প্রায়ই দেখা যেত ভুরিভুরি কাপ মেডেলের মধ্যে কাগজের পাতায় বসে ইলা সেন হাসছেন।

১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে প্রবেশিকা পাস

এবং বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন এবং টেনিকোয়েটে পারদর্শিতা। অবশ্য স্কুলে পড়ার সময়েই এ সব খেলা ধূলায় ইলা সেনের কিছু কিছু দখল ছিল। কলেজ জীবনে এল পূর্ণতা। ১৯৪০ ও ৪১ সালে ইলা সেন আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন। এ দু' বছরই টেনিকোয়েটের চ্যাম্পিয়ন হলেন সুধা দত্তের সঙ্গে খেলে। ১৯৪১ সালের আন্তঃকলেজ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ন, বেথুন কলেজেরও উনি ছিলেন অন্যতমা খেলোয়াড়।

১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে আই-এ পাস করবার পর খেলাধূলার সঙ্গে ছেদ পড়ে। তখন অন্য খেলায় মেতে ওঠেন। ওর কাছে তখন আসে দেশের কাজ করার ডাক, সংগঠনের ডাক। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ই আর কয়েকটি মেয়ের সহযোগিতায় ইলা সেন গার্লস স্টুডেন্টস কমিটি গঠন করেন। কলকাতায় জাপানী বোমার বিভীষিকায় এক বছর যশোরে কাটিয়ে এসে ভর্তি হন উইমেনস কলেজে। বাংলায় অনার্স সমেত বি এ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসেন ১৯৪৪ সালে। পরের বছর মালদার দেশকর্মী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে ইলা সেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী-স্ত্রী একই পথের পথিক। দু'জনেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সমাজ সেবা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে হেসে খেলে দিন কেটে যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ইলা সেনের শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম রামচন্দ্রপুর সমেত মালদার নবাবগঞ্জ সাব-ডিভিশন রাজসাহীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তানভুক্ত হয়। তখন ওরা দেশের মধ্যেই সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প করেন। অনুন্নত মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য ইলা মিত্র এক স্কুল গড়ে তোলেন, গড়ে তোলেন কৃষকআন্দোলন। নিজের পয়সার প্রয়োজন ছিল না, কেননা শ্বশুরকুলে ছিল অর্থের প্রাচুর্য।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার মহিলা ও কৃষক আন্দোলনকে বরদাস্ত

করতে পারলেন না। ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পয়োয়ানা বের হল। একদিন দু'দিন বা একমাস দু'মাস নয়, তিন বছর পাক সরকারের পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কলকাতার স্পোর্টসে বস্তাবন্দী দৌড়ে (স্যাক্ রেস) যে মেয়েটি বরাবর ফার্স্ট হয়েছে তাকে বন্দী করা কি অত সোজা? কতবার যে পুলিসের বেড়াজাল এড়াতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কখনো দু'তিন মাইল দৌড়ে, কখনো কূয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, কখনো নদীতে সাঁতার কেটে, কোন কোনদিন বিশ পঁচিশ মাইল হেঁটে। ইলা মিত্র বলেছেন—'স্পোর্টসে পোক্ত হয়েছিলাম বলেই এ ধকল সইতে পেরেছি।'

ধকল কি এক রকমের? কত বিচিত্র কাহিনী। পেটে অন্ন নেই, মাথায় তেল নেই, চোখে ঘুম নেই। কাজ আর কাজ। ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে যখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়, তখন তিনি ভবিষ্যৎ সন্তানের মা। ঐ অবস্থায় পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে কলকাতায় এসেছেন। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে শাশুড়ীর জিম্বায় রেখে আবার ফিরে গেছেন 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডের' কর্মকেন্দ্রে। তারপর··· !

তারপরের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা। রাজসাহীর নাচোলের মাঠে বুলেট বৃষ্টিতে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। কৃষকের লাশে ভরে যায় শস্যশূন্য মাঠ। সাঁওতালের তীরে পুলিসও মরে ৪ জন। কৃষক আন্দোলনের এক নম্বর আসামী ইলা মিত্র তখন পাক সরকারের পয়লা নম্বরের শত্রু। হাতের শাখা ভেঙ্গে, নোয়া খুলে, এয়োতির চিহ্ন মুছে, কেশগুচ্ছ ছেটে ফেলে তখনও তিনি পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু গোয়েন্দার চোখ কতদিন ফাঁকি দেওয়া যায়? তিন বছর আত্ম গোপনের পর ১৯৫০ সালে ইলা মিত্র বন্দী হলেন।

'তারপর যাহা ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন কালে'। রাষ্ট্ররক্ষকদের হাতে বন্দিনী রমণীর লাঞ্ছনা।

মুসলিম রাষ্ট্রের অমানুষিক অত্যাচারে মর্মাহত মুসলমান কবি গোলাম কুদ্দুসের কলমে সে কাহিনী ফুটে উঠেছে। 'ইলা মিত্র' নামে কাব্যগ্রন্থের এক যায়গায় তিনি লিখেছেন—

... ...

প্রথমে থানায় নিয়ে যায়,
"বল্ তোর সঙ্গী-সাথী কোথা ?"
ইলা মিত্র নির্বাক নিশ্চুপ।
"কোথায় লুকিয়ে আছে বল্ ?"
ইলা মিত্র নিঃশব্দ কঠিন,
তারপর যে কাহিনী সেটা—
ভাই হয়ে বলিব কেমনে ?
বস্ত্র গেল, লজ্জা গেল, গেল
যা কিছু যাবার পশু গ্রাসে,
থানার দেওয়ালগুলো যদি
হৃদপিণ্ড হত, যেত ফেটে!
স্তব্ধ রাত্রি, বায়ু গতিহীন,
নাচোলের মাঠে তীব্র জ্বালা।
ইলা মিত্র ফাঁসির আসামী!
লোকারণ্য রাজসাহী কোর্ট!

... ...

এক বছর ধরে কেস চলে। পুলিসের অত্যাচারে হাড়গোড় ভাঙ্গা শরীর নিয়ে স্ট্রেচারে শায়িত হয়ে কয়েদখানা থেকে ইলা মিত্র কোর্টে আসেন। উকীলের অভাবে নিজেই করেন আত্মপক্ষ সমর্থন। পরে অবশ্য উকীল মেলে। প্রথমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। পরে আপীলে হয় ১০ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু অসুখে পড়ে ইলা মিত্র 'প্যারোলে' মুক্তি পেয়ে চলে আসেন কলকাতায়।

কিন্তু অন্ন সংস্থানের পথ কি ? না বই লেখা, কাগজে কাগজে

প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা। এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন আর এই সময়ের মধ্যে একে একে ওর অনুদিত 'জেলখানার চিঠি', 'হিরোসীমার মেয়ে', 'চাপায়েভ' ও 'মনে প্রাণে' (হার্ট এণ্ড সোল) প্রকাশিত হয়।

বি-এ পাস করার ১৪ বছর পরে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে ১৯৫৮ সালে ইলা মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাস করেন এবং ঐ বছর সিটি কলেজ সাউথের বাংলার অধ্যাপিকার পদ পান।

ইলা মিত্র এখন কলকাতার নাগরিক। ৩৫ নম্বর বাদুর বাগান স্ট্রীটে স্বামী পুত্র নিয়ে ওঁর এখন শান্তির সংসার। ১৩ বছরের একমাত্র ছেলে রণেন সেন্ট পলসের ক্লাস নাইনের ছাত্র। ক্রিকেটে অসম্ভব অনুরাগ। বল লেগে ডান চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এখানকার চিকিৎসায় হালে পানি না পেয়ে ইলা মিত্র ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ায়। ছেলের চোখে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই ছিল না। এখন একটু একটু করে দৃষ্টি ফিরে আসছে।

নিজেও খেলাধূলার মধ্যে আবার জড়িয়ে পড়েছেন। এখন শিক্ষিকা হিসাবে। উচাঙ্গ সঙ্গীত, সেতার, আবৃত্তি, অভিনয়ে আগেও দক্ষতা ছিল, এখনো আছে। সংগঠন মূলক কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন আগের মত। এ বছর উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র থেকে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির মেম্বার হয়েছেন। এত কাজের মধ্যেও খেলার ডাকে ওঁর সদাই সাড়া মেলে।

কল্যাণময়ী কল্যাণী



কল্যাণী বসু

কালীঘাটে বাস। পাল-পার্বণ, পূজা-অর্চনার জন্য কালীগঙ্গার সঙ্গে অহর্নিশি পরিচয়। কিন্তু বড় গঙ্গার নামে চক্ষু চড়কগাছ। 'বাব্বাঃ, সোজা কথা নয়। যার বেগ সামলাতে স্বয়ং জটাধারী শিবকে মাথা পেতে দিতে হয়েছিল সেই ভাগীরথীতে সাঁতার কাটবে ঐ দুধের মেয়ে?' ঠাকুমা বেঁকে বসলেন। কিছুতেই তিনি মত দেবেন না। না কিছুতেই না। 'তোমরা যতই বল বাপু সে আমি কিছুতেই প্রাণ থাকতে রাজি হতে পারব না'—এই তাঁর শেষ কথা।

এদিকে আর একজনেরও শেষ কথা—'মত দেবেন তো দিন, না হলে আফিং খাব।' কাগজের মোড়ক খুলে দেখালেন সত্যিই তাতে এক ড্যালা আফিং। সবাই ভয়ে অস্থির। কালীঘাট অঞ্চলের ৮সি মুখার্জিপাড়া লেনের বাড়িতে এক ভীতি-বিহ্বল নিস্তব্ধতা।

যেন একখানি একাঙ্কিকা নাটিকার অভিনয় হচ্ছে। এ নাটিকার নায়িকা কল্যাণী, দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে। অন্যান্য চরিত্রে কল্যাণীর

মা, বাবা, ঠাকুমা ও তার সাঁতারশিক্ষক বিমল দে, যার হাতে আফিং-এর ড্যালা।

দু'জনের প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা। ঠাকুমা প্রাণ থাকতে মত দেবেন না। বিমল দে মত না পেলে আফিং খেয়ে প্রাণ হারাবেন।

মহাসমস্যায় পড়লেন বৃদ্ধা মহিলা। তাঁর মনের উপর ভেসে উঠল অতীত আশঙ্কার কত বিচিত্র চলচ্ছবি। যুদ্ধের সময়কার সেই সব ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা। কল্যাণী তখন মাতৃজঠরে। 'সাইরেনের' সঙ্কেত পেতেই বোমা পড়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বৌমাকে নিয়ে স্লিট ট্রেঞ্চে ঢোকা, অজানা আশঙ্কায় সব সময় সসঙ্কোচে থাকা, কখন কি হয়! তারপর ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য দিনে কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হবার পর বাড়িতে কত আনন্দ। যুদ্ধের আক্‌কারার বাজারে কত কষ্টে তার জন্য দুধ, ফুড সংগ্রহ করে তাকে বড় করে তোলা। সেই আদরের নাতনীকে সবাই জলে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। 'কেমন বাপ-মা জানি না বাবা। আর মেয়েও মেয়ে। একটু ভয় নেই!'

'সাঁতার অবশ্য একটু শিখেছে মেয়েটা। কিন্তু লেকের কাকচক্ষু বদ্ধ জলায় সাঁতরানো, আর গঙ্গার ঘোলা জলের ঢেউ, তুফান ও স্রোতের মধ্যে সাঁতরানো কি এক কথা? জন্তু জানোয়ারই কি এখানে কম?'

এমনি নানা চিন্তার মধ্যেও ঠাকুরমাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হল। না হলে বিমল দে আফিং গিলছিলেন আর কি।

ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা মহিলা ভাবলেন—পরের ছেলে বাড়ির পরে আফিং খেয়ে মরবে তার চেয়ে মত দেওয়াই ভাল। মা গঙ্গার মনে যা আছে হবে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দুষ্টু হাসি হাসল কল্যাণী। কারণ ও জানত মাস্টারমশাই যা খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন তা আফিং নয়—তোলা দুই ওজনের এক ড্যালা পুরনো তেঁতুল।

১৯৫৩ সালের ৮ই নবেম্বর। বালি ব্রিজ থেকে আহিরীটোলা ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা। ভারতের তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যোক্তা ন্যাশনাল ইউথ ইনস্টিটিউট—কংগ্রেসের গণ্যমান্যদের নিয়ে গড়া সংস্থা। ভারতের গণ্যমান্য সাঁতারুরা নিমন্ত্রিত। তার মধ্যে তখনকার সাঁতার-সম্রাজ্ঞী বোম্বের ডলী নাজির অন্যতমা। আরতি এবং ভারতী সাহারও তখন দেশ-জোড়া নাম ডাক। পুরুষ মেয়ে মিলে মোট ৬৮ জন প্রতিযোগী। সর্বকনিষ্ঠা কল্যাণী বসু। বয়স মাত্র দশ বছর।

প্রতিযোগিতার নিয়ম হিসাবে বে-আইনী। কারণ ১২ বছরের কম ছেলেমেয়ের এ প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল না। অধিকার অর্জনের জন্য একটা অবৈধ উপায় গ্রহণ করতে হ'ল। দশ বছরের মেয়ে কলাণীকে চালানো হল ১২ বছর বলে।

বালি ব্রিজের পাশে সাঁতারু সমাগমে রাজ্যপাল হরেন্দ্র মুখার্জির ছোট্ট ভাষণ। সেখানে বুকে পিঠে প্রতিযোগীর নম্বর এঁটে কল্যাণীকে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজ্যপাল অবাক। ভয় পেলেন তিনিও। কল্যাণীর মাকে বললেন চুপি চুপি,—'মেয়েটাকে মেরে ফেলবেন নাকি!' অভয় দিলেন বিমল দে। 'কিছু ভাববেন না। ও ঠিক বেরিয়ে যাবে।' রাজ্যপাল শুধু একটু মুচকি হাসি হাসলেন।

সত্যিই বেরিয়ে গেল। মাঝ দরিয়ায় মাঝি-মাল্লা এবং দুই কুলের দর্শকদের হাততালি পেতে পেতে ও আহিরীটোলা ঘাটে এসে পৌঁছল ৪৯ জনের পরে।

কংগ্রেস ভবনে রাজ্যপালের সহধর্মিণী শ্রীমতী বঙ্গবালার হাত থেকে সাঁতারের এই 'বঙ্গবালা' পুরস্কার গ্রহণের সময় রাজ্যপাল আবার হেসেছিলেন। 'না ডোবেনি তো মেয়েটা।'

তবে হ্যাঁ ঠাকুমা যে গঙ্গায় তার আদরের নাতনীর ডোবার ভয়

করেছিলেন সেই গঙ্গাতেই একবার ডুবতে বসেছিল কল্যাণী। নৈহাটি থেকে হুগলী পর্যন্ত দেড় মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার সময় একখানা স্টীমার তাকে প্রায় চাপা দিয়ে বসেছিল আর কি। চারিদিক থেকে 'গেল' 'গেল' রব উঠতে সারেঙ্গ জোর হাতে হাল ঘুরালেন, স্টীমারখানা কল্যাণীর প্রায় গা ছুঁয়ে জল কেটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে কল্যাণী প্রায় আধ মাইল গেল পিছিয়ে। অগত্যা নৌকোয় টেনে তোলা হ'ল তার অর্ধ-অচেতন দেহ। এটাও ১৯৫৩ সালের কথা।

মেট্রিক সাঁতারে কল্যাণীর প্রথম অংশ গ্রহণ ১৯৫৪ সালে 'আজাদ হিন্দ বাগে' সুইমার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সাঁতার প্রতিযোগিতায়।

১৯৫৫ সালে আজাদ হিন্দ বাগে ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কল্যাণীর ডাক পড়ল। ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তৃতীয় স্থান। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম সাফল্য। রিলে রেসে বাঙলা বিজয়ী হ'ল বোম্বের বিরুদ্ধে। রিলে টীমের প্রথম মেয়ে কল্যাণী প্রথম দুই পাকে যে 'লীড' দিয়ে দিল সন্ধ্যা, আরতি ও ভারতী সেই লীড রেখেই বাঙলাকে করল জয়যুক্ত।

১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় সাঁতার। বাঙলার দল গড়ার জন্য আজাদ হিন্দ বাগে ট্রায়াল। ভারতী সাহা তখন ফ্রি স্টাইলে বাঙলার এক নম্বর মেয়ে। সন্ধ্যা চন্দ্রের উঠ্‌তি সুনাম। ট্রায়ালে কল্যাণী ভারতীকে হারিয়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান দখল করল। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে একই বিষয়ে সন্ধ্যাকে হারালো দু'বার। তারপর সন্ধ্যা ও কল্যাণীর মধ্যে বারবার পাল্লা। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে। জলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেণ্ট্রাল ও ন্যাশনালে। দুই ক্লাবের দুই রত্ন। সেণ্ট্রালের সন্ধ্যা, ন্যাশনালের কল্যাণী। কে শ্রেষ্ঠতম? এই নিয়ে আলোচনা। বলা বাহুল্য, সন্ধ্যার সাফল্যই বেশি।

তবু পরের বছর স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত যুবজয়ন্তী উৎসবের সাঁতারে সন্ধ্যা ও কল্যাণীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর সন্ধ্যাকে হারিয়ে কল্যাণী করল ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বাঙলার নতুন রেকর্ড। কল্যাণীর জীবনের প্রথম। এ বছরের বিভিন্ন স্পোর্টস থেকে দু'হাত ভরে পুরস্কার ঘরে তোলবার পর ১৯৫৮ সালে দিল্লিতে ভারতের জাতীয় সাঁতারে ও পেল জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

রেকর্ড নয়। রেকর্ডের চেয়েও বড় কৃতিত্ব। দীর্ঘ ১১ বছর পরে ভারতীয় সাঁতারের রানী পার্শী মেয়ে ডলী নাজিরকে হার স্বীকার করতে হল বাঙলার এই কালো মেয়ের কাছে।

ঘোড়দৌড়ে 'ডার্ক হর্স' বলে একটি কথা আছে। এর অর্থ এই নয় যে, ঘোড়ার রঙ কালো। 'ডার্ক হর্স' তাকেই বলা হয় যে ঘোড়া জেতার সম্ভাবনার বাইরে থেকেও রেস জিতে যায়। এখানে কল্যাণীকে কিন্তু দুই অর্থেই 'ডার্ক হর্স' বলা যেতে পারে। তার গায়ের রঙও কালো, আবার সম্ভবনার বাইরে থেকেও সে অসম্ভব সম্ভব করেছে। ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে যেভাবে সে ডলীকে হারাল সেটাও প্রায় 'হর্স রেসের' পর্যায়ে পড়ে। প্রতিযোগিতা শেষ হতে যখন মাত্র ২৫ মিটার বাকী তখনও সে পঞ্চম স্থানে। কিন্তু লম্বা লম্বা হাত চালিয়ে একে একে ফেনি মিস্ত্রী, সন্ধ্যা চন্দ্র ও ডলী নাজিরকে হারিয়ে সে হল বিজয়িনী। দিল্লীতে জাতীয় সাঁতারের আসরে সিংহাসনচ্যুত হল ডলী নাজির। পরাজয়ের এই গ্লানিতে ডলী আর কোন প্রতিযোগিতাতেই অংশ গ্রহণ করল না। এই সাঁতারের পর 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার' সংবাদদাতা লিখলেন ঃ

"...But the most exciting finish of the day's events was provided in 200 meters free style event for women which won by another Bengal School girl Kalyani Bose. The tall well-built Bengali girl

surprised every one with a terrific last lap finish to beat the holder Dolly Nazir in her last five meters."

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও কল্যাণী ফার্স্ট। ১০০ মিটারের ফ্রি স্টাইল এবং ব্যাক স্ট্রোকে ফার্স্ট সন্ধ্যা, ব্রেস্ট স্ট্রোকে অনুরাধা গুহঠাকুরতা, রিলে রেসে বাঙলার টীম। মেয়েদের সব ক'টি প্রথম পুরস্কারের অধিকারিণী বাঙলার মেয়েরা। তার উপর ব্যাক স্ট্রোক ও রিলে রেসের দু'টি রেকর্ড। কল্যাণীর একার হাতে তিনটি পুরস্কার। বাঙলার জয়জয়াকার।

১৯৫৮ সালে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কল্যাণী ভর্তি হল স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৯৫৯ সালে আন্তঃ কলেজ সাঁতারে মেয়েদের বিভাগের প্রায় সমস্ত পুরস্কার এল স্কটিশ চার্চ কলেজের হাতে—সমস্ত প্রথম স্থানের পুরস্কারের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার এল স্কটিশের ছাত্রী কল্যাণীর দখলে। বোম্বেতে জাতীয় সাঁতারে ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ও আবার পেল প্রথম স্থান। ১৯৬০ সালের আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় আবার চ্যাম্পিয়নশিপ। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই বছর আজাদ হিন্দ বাগে জাতীয় সাঁতারে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা। দিল্লীতে কল্যাণী পরাজিত করেছিল স্বয়ং ডলী নাজিরকে, এখানে ম্লান করল তার কৃতিত্বকে।

দিল্লীর ন্যাশান্যাল স্পোর্টস ক্লাবের সুইমিং পুলে ১৯৬১ সালের জাতীয় সাঁতারে কল্যাণীর ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ধ্যা চন্দ্র। কিন্তু ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কল্যাণী হয়েছে নতুন রেকর্ডের অধিকারিণী। এবার ম্লান হয়েছে ডলী নাজিরের আর একটি রেকর্ড। ১৯৫৬ সালে ৫ মিনিট ৩০·৬ সেকেণ্ডে ডলী নাজির ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন। কল্যাণীর নতুন সময় হয়েছে ৬ মিনিট ২৫·৩ সেকেণ্ড। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে আন্তঃ

কলেজ সাঁতারে সমস্ত বিষয়ের প্রথম স্থানের পুরস্কার আবার গিয়েছে কল্যাণীর হাতে।

কল্যাণীর সাঁতার জীবনের শুরু ঢাকুরিয়া লেকে। উন্নত শিক্ষা ন্যাশন্যাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে। প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু ঢাকুরিয়া লেকে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের লাইফ সেভার বিমল দে, পরে দিলীপ মিত্র ও সুশীল ঘোষ।

খেলার নেশা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ঠাকুরদাদা পশুপতি বসু ছিলেন নামকরা মল্লবীর। বাবা সৌরেন্দ্রনাথ বসু সর্ববিশারদ স্পোর্টসম্যান। পাকা ছ' ফুট লম্বা বিরাট পুরুষ। বয়স এখন ৫২। দেহের বাঁধুনী দেখলে কিন্তু ৩৫-এর বেশি মনে হয় না। যৌবনে দৌড় ঝাঁপ করেছেন, বক্সিং লড়েছেন। সাঁতারের নেশা এখনও কাটেনি। সকালবেলা লেকে গিয়ে সাঁতার কাটা সৌরেনবাবুর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

মা-বাবার চেহারার ছাপ কল্যাণীর মধ্যেও সুস্পষ্ট। অষ্টাদশী কুমারীর এমন দীর্ঘ কান্তি বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। কল্যাণীর দেহের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। বাপ্‌কা বেটী।

ঘরে ও বাইরে কল্যাণী সত্যিই কল্যাণময়ী। মেয়েটির ছোটবেলা থেকে শখ ছিল শার্ট পরে ডাক্তার হবে। অভীষ্ট পূরণের সূচনাও দেখা দিয়েছে। এই বছরই স্কটিশ থেকে আই এস সি পাশ করে ভরতি হয়েছে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজে। বলতে দ্বিধা নেই— আউটস্ট্যাণ্ডিং স্পোর্টস গার্ল হিসাবেই কলেজ কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে সাদরে স্থান দিয়েছেন।

শুধু সাঁতারেই নয়। অন্যান্য খেলাধূলা, গানবাজনা, সেলাই ফোড়াই সব কিছুতেই কল্যাণীর আগ্রহ। অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের কিছু কিছু প্রাইজও রয়েছে তার আলমারির তাকে, আর রয়েছে একটি রাইফেল শুটিংয়ের পুরস্কার।



মীনাক্ষী চৌধুরী 'গোস্বামী'

'যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না,
যে চুল বাঁধে সে রাঁধে না।'

একটা কাজের অছিলায় আর একটা কাজ অসমাপ্ত রাখার নজির বাঙালী ঘরে ভুরি ভুরি। আবার বাঙালী ঘরে এমনও বহু মেয়ে আছে যারা রাঁধে, চুলও বাঁধে, ঘর নিকোয় জল তোলে, বাসন মাজে—সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনা, লেখাপড়া খেলাধূলাও করে। নাচে গানে, হাসিতে খুশিতে সংসারকে মধুময় করে তোলে। নিজের জীবনকে গড়ে তোলে পরিপূর্ণ মহিমায়।

লেখা পড়ার সঙ্গে খেলাধূলা ক'রে যশস্বী হয়েছেন, আবার হৈ-হল্লাও বাদ যায় নি—এমন একটি মেয়েকে আজ উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে।

পরিচয় পরে। আগে তার কৃতিত্বের কথাই সংক্ষেপে বলা যাক ঃ

স্কুলে পড়বার সময় ভলিবল, বাস্কেটবল ও অ্যাথলেটিকসে পারদর্শিতা ; বিজয়ী টীমের অধিনায়িকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন ; খেলাধূলার নানা বিষয়ে নানা পুরস্কারের অধিকারিণী।

কলেজে কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ ; ভলিবল ও বাস্কেটবলে আন্তঃ জেলার শ্রেষ্ঠত্ব—বিজয়ী দলের অন্যতমা ; কমল নারায়ণ ভলিবল ও সোহনী উইমেনস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার।

ইউনিভার্সিটির সব খেলাধূলায় সম-পারদর্শিতা ; সহপাঠিদের

সহযোগিতায় ১৯৫২, ৫৩ ও ৫৪ সালে জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর সম্মানের সমভাগ। ১৯৫৩ সালে মেয়েদের সইকেল রেসে এলাহাবাদের ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন; ১৯৫৪ সালে ব্যাডমিণ্টনে ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ সম্মান।

আরো আছে—

১৯৫৩ সালে উত্তর প্রদেশ অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে সেরা মেয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার; ১৯৫৪ সালে অল ইণ্ডিয়া ইণ্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টসে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব—ডিসকাস, জ্যাভেলিন, সটপাট ও হাই জাম্পে প্রতিযোগিতা; ডিসকাসে সিংহলে ও ব্যাঙ্গালোরে দ্বিতীয় স্থান; বাঙলায় আয়োজিত জাতীয় বাস্কেটবলের আসরে অবাঙালী টীমের বাঙালী মেয়ে; মস্কোতে বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব।

এইখানেই শেষ নয়। অন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর অবশ্য অন্যত্র। শুধু খেলাধূলায় নয়। লেখাপড়া ও শিল্প চর্চায়।

১৯৫০ সালে জগত্তারণ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে প্রবেশিকা পাশ,—ইউ পি বোর্ডের পঞ্চাশ ষাট হাজার মেয়েয় মধ্যে চতুর্দশ স্থান। ১৯৫২ সালে একই কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে ইণ্টারমিডিয়েট; এবার চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মেয়ের মধ্যে একাদশ। ১৯৫৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী।

অভিনয়ে অসাধারণ, নৃত্য গীতে গীতিময়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ভাল দখল। ডিগ্রী কোর্সে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ছিল অন্যতম বিষয়।

১৯৫২ সালে এলাহাবাদে অল ইণ্ডিয়া ডিবেটে মেয়েদের মধ্যে প্রথম।

আবার খেলাধূলা—

এক ছেলের মা হয়ে এলাহাবাদের ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট ব্যাডমিণ্টনে অংশ গ্রহণ; দুই ছেলের মা হবার পর সাঁতার শুরু, নিয়মিত ব্যাডমিণ্টন অনুশীলন, সঙ্গে সঙ্গে ঘর সংসারের আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা হাফিয়ে উঠেছেন, আর অতি-শয়োক্তির অভিযোগে মনে মনে অভিসম্পাত করছেন আমাকে। হয়তো ভাবছেন এমন 'জ্যাক অব অল ট্রেড' মেয়েটি কে? আমি ঠিকানা দিতে রাজি আছি। যদি বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে চাক্ষুষ দেখে আসতে পারেন ক্রীড়াঙ্গন ও বিদ্যাপীঠ থেকে আহরিত এই সর্বাবিদ্যা বিশারদ মেয়েটির পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রের রাশি।

আমি কিন্তু ভাবছি কিছু বাদ গেল কি না? হ্যাঁ, বাদ গিয়েছে বৈকি। গীটারে একটুখানি দখলের কথা বলা হয়নি। খেলার কথাও বাদ গিয়েছে। ১৯৫২ সালে ওরা অর্থাৎ ওদের টীম ছিল এলাহাবাদের মহিলা হকি চ্যাম্পিয়ন। হকিতে খেলতেন সেণ্টার হাফে। আর বলা হয়নি এম-এ ও আইন ক্লাসে কিছুদিন তাঁর অধ্যয়নের কথা। নব নব ছন্দে পড়া এই মেয়েটির এখানেই খেই হারিয়ে গেছে। দুই নৌকোয় চড়তে গিয়ে—না পেয়েছেন 'মাস্টার' ডিগ্রী, না হয়েছেন আইন বিশারদ।

আপনাদের হয়তো বুঝতে বাকী নেই—এ মেয়ে বাঙলার আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন নি। তবে এঁর সন্ধানের জন্য উত্তর প্রদেশেও যেতে হয়নি আমাকে। বাঙলাতেই এসে ধরা দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী মীনাক্ষী চৌধুরী; এখন অবশ্য আর চৌধুরী নন, মীনাক্ষী গোস্বামী, পোর্ট কমিশনার্সের মেরিন ইঞ্জিনিয়ার—শ্রীবাচস্পতি গোস্বামীর সহধর্মিণী।

ছ'সাত বছর আগের কথা। কলকাতা ময়দানে জাতীয় বাস্কেটবলের আসর। স্বীকার করতে বাধা নেই—বাস্কেটবল বাঙলায় তখনো তেমন জনপ্রিয় নয়। তবু জাতীয় প্রতিযোগিতায় কিছুটা জাঁকজমক ছিল বহু বাইরের টীমের আগমনে।

মেয়েদের বিভাগে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে বাঙলার খেলা দেখে সবাই অবাক। এক দলে রেণু সিমলাই, নির্মলা মুখার্জী, মীনাক্ষী চৌধুরী, শুক্লা রায়, এষা চ্যাটার্জী, অন্য দলে রোজ, মেরী, মার্গারেট,

ভালসির দল। এক দলে বাঙলা ভাষার কলকাকলী,—'রেণুদি জলদি, শুক্লা বল দে, এষা এদিকে', অন্য দলে ইংরেজীর কচকচি—'কুইক্ কুইক্, মুভ অন, গিভ মি, নাউ ইওর চান্স' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন্‌টি বাঙালার টীম? কৃষ্ণ কুন্তল, কালো চোখ, দীর্ঘ দেহী বাঙালী মেয়েদের নিয়ে গড়া টীম, না, বব্‌ছাট, কটা চোখ ও স্বল্পবাসের শ্বেতাঙ্গিনীর দল? সবারই ভুল হবার কথা। ভুল প্রথমে আমারও হয়েছিল। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতেও দেরি হল না। বাঙলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা উত্তর প্রদেশের বাঙালী মেয়েদের হারতে দেখলাম বাঙলার ফিরিঙ্গি মেয়েদের কাছে। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতি যেয়ে পড়ল প্রবাসী দলের উপর। তখন দেখেছিলাম মীনাক্ষীর মনমাতানো খেলা। শুনেছিলাম তাঁর ক্রীড়া-পটুতার অনুচ্চ গুঞ্জন।

ঠিক একই ঘটনা ঘটল ১৯৫২ সালে মস্কোর বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় দল পাঠাবার সময়। সারা ভারত থেকে খুঁজে বের করে যাদের মস্কো পাঠান হল তারা সবাই প্রায় উত্তর প্রদেশের মেয়ে। তবে ১২ জনের মধ্যে ৭ জনই প্রবাসী বাঙালী। এতে বাঙলার গৌরব নেই। কিন্তু বাঙালীর গৌরব আছে। ভারতের চোখে বাঙলা ছোট হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের চোখে বাঙালী হয়েছে অনেক বড়।

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল অবশ্য ভাল খেলতে পারেনি। ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশের জোয়ান জোয়ান মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক রকম তলিয়ে গেল। কিন্তু মস্কো ডায়নামোর বিরাট স্টেডিয়ামে বা রেড স্কোয়ারের মস্কো হোটেলে তলিয়ে গেল না ভারতীয় দল। সেখানে তাদের কি সম্মান! শহরের দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠলো শাড়ি পরা বাঙালী মেয়েরা। আর মীনাক্ষী চৌধুরী হলেন তাদের মুখপাত্রী।

উত্তর প্রদেশের সেই মীনাক্ষী আজ বাঙলার বৌ। মাটির টানে আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন।

টান অবশ্য চিরদিনই ছিল। যে গোস্বামী পরিবারে মীনাক্ষীর বিয়ে হয়েছে সেই পরিবারের বড়বৌ মীনাক্ষীর বড় বোন বাসন্তী। কলকাতার সায়েন্স কলেজের এপ্লায়েড কেমিস্ট্রির পরলোকগত অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং এলাহাবাদের কর্নেলগঞ্জ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুহৃদচন্দ্র চৌধুরী আগে থেকেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৫৬ সালে বাচস্পতি গোস্বামীর সঙ্গে মীনাক্ষীর বিয়ের পর পুরনো সম্বন্ধ আবার ঝালানো হ'ল।

মীনাক্ষীরা প্রায় তিন পুরুষের প্রবাসী। ঠাকুরদাদা ঘর বেঁধেছিলেন কাশীতে। সেখান থেকে বাবা এলাহাবাদের ট্যাগোর টাউনে এসে ঘর বেঁধেছেন প্রায় ৫০ বছর আগে। তবে বাঙলার সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ এখনো নিবিড়।

মা-বাবার ৮ সন্তানের মধ্যে মীনাক্ষী ষষ্ঠ। ৪ ভাই, ৪ বোন। বোনেদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মীনাক্ষী। শুধু মীনাক্ষীই নয়, মা-বাবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ৮ সন্তানই খেলাধূলায় পটু, শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। সব ছেলেমেয়েই গ্রাজুয়েট, এর মধ্যে তুই মেয়ের মাস্টার ডিগ্রী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী।

মা চেয়েছিলেন সব ছেলেমেয়েকেই মনের মত করে মানুষ করতে। লেখাপড়া শিখবে, গানবাজনা করবে, খেলাধূলায় পটু হবে। হয়েছেও তাই। মীনাক্ষী চৌধুরী নিজে বলেছেন—'মা-র ছিল কড়া শাসন। পড়াশুনো না করলে মুখ ভার। তাই আমরা পড়াশুনো ও খেলাধূলার উপর সমান জোর দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাজকর্মেও। এমন আন্তরিকতা, এমন নিষ্ঠাই তো সাফল্যের সোপান।

জগত্তারন গার্লস কলেজে পড়ার সময় থেকেই মীনাক্ষী দেবীর

প্রতিভার বিকাশ। সাফল্যের মূলে কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা সুরভি সিংহ। বাঙলার তো বটেই হয়তো ভারতের সর্বপ্রথম আইন পাস মহিলা। তবে গাউন পরে কোনদিন কোর্টে যাননি, সংসার জীবনেও আবদ্ধ হননি। বই হাতে করেই এক রকম জীবন কেটে গেল, প্রথন জীবনে ছাত্রী হিসাবে পড়ে, এখন ছাত্রীদের পড়িয়ে।

শ্রীযুক্তা সুরভি সিংহের কুশল পরিচালনায় জগত্তারন কলেজ আজ খেলাধূলা ও লেখাপড়ায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ। কলেজের স্টেজেই এলাহাবাদের গন্যমান্যরা একবার ঝাঁসির রাণী অভিনয় করেন। নাম ভূমিকায় মীনাক্ষী চৌধুরীর তেজোদৃপ্ত হুঙ্কার—'মেরী ঝাঁন্‌সী নেহি তুঙ্গী' আজও নাকি অনেকের মনে আছে। আর মনে আছে অভিনয়ের আগে তার অপূর্ব নৃত্য —মহাদেবের প্রলয় নাচ।

খেলোয়াড় জীবনে মীনাক্ষী চৌধুরী অনেক বড় খেলোয়াড়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছেনও তাদের কাছ থেকে। ব্যাডমিণ্টনে ত্রিলোক নাথ শেঠ, বর্শা ছোড়ায় বুড্ডি মালবিয়া, অ্যাথলেটিকসে খুরসীদ আমেদ, ভলিবলে লালজি, হকিতে দলজিৎ সিং ও ওয়াহিদুল্লা মীনাক্ষীকে উন্নত শিক্ষায় পটু করে তুলেছেন।

দীর্ঘ দেহ, নিটোল স্বাস্থ্য মীনাক্ষী দেবীর। সত্যিই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি।

বাচস্পতিবাবু গর্বভরেই বললেন—"সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশনে চাকরী করার সময় বিশ্বের বহু দেশে আমার ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছে। খেলাধূলা এবং স্পোর্টস অনেক দেখেছি। কিন্তু ওদেশের যে সব মেয়ে খেলাধূলা করে তাদের তেমন দেহশ্রী নেই। কেমন যেন অ্যামাজোনিয়ান টাইপ। পুরুষালী চেহারা। কিন্তু আমাদের বাঙালী মেয়েরা সেদিক দিয়ে নারীত্বের পূর্ণ মাধুর্যে ভরপুর।"

মীনাক্ষী দেবীর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম তাঁর স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বাচস্পতিবাবু বিবাহিত জীবনে সত্যিই সুখী। অমন ঘরণী যার ঘরে তিনি সুখী হবেন না? শুধু স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খেলাধূলার জন্যই নয়, গৃহকর্ত্রী হিসাবেও। মীনাক্ষী গোস্বামী এখন সু-পটু গৃহিণী, সংসারের যাবতীয় কাজ কর্মের তদারককারিণী, দুই পুত্র দীপঙ্কর ও শুভঙ্করের গৃহ-শিক্ষিকাও। ঘরের বাইরে ঢাকুরিয়া লেকের এণ্ডারসন ক্লাবের সভ্যা। ওখানেই এখন খেলাধূলার চর্চা। সংসার তাঁর সুখের নীড়। ক্লাব তাঁব যৌবনের উপবন। নব নব ছন্দে গাথা মীনাক্ষী দেবীর জীবন।

সেনা-নায়িকা



মায়া দে (গাঙ্গুলী)

১৯৪০ সাল। উনিশ কুড়ি বছরের একটি তন্বী মেয়ে হাফ প্যান্টপরে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে ঘুরতে অবলীলাক্রমে বঙ্গোপ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে আধমাইলখানেক সাঁতার কেটে ঢেউ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আবার কুলে ফিরে এল।

প্রথিতযশা সাঁতারু যা করলে সংবাদপত্রের খোরাক হত, কাগজে কাগজে ছবি বেরোত, একটি অজানা বাঙলী মেয়ের সে কৃতিত্ব অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেল। পুরীর সমুদ্র সৈকতে মায়া দে-র সাঁতার কাটার সেই স্মৃতি আজো কিন্তু আমার চোখে ভাসছে।

মায়া দে তখন ছিলেন বেথুন কলেজ ও স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস।

তারপর মায়া দে-কে দেখলাম জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর (ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) প্রথম ব্যাচের মেয়ে হিসাবে। ১৯৪৯ সালে তাঁর কাঁধে একটি তারা—সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট। ১৯৫২ সালে কাঁধে উঠলো ছুটি তারা—ফুল লেফটেন্যাণ্ট। ১৯৫৭ সালে তিনটি তারার অধিকারিণী। মায়া দে (গাঙ্গুলী) এখন ন্যাশনাল

ক্যাডেট কোরের ক্যাপ্টেন। খেলা ধূলার সেবাধর্মী সেনা-নায়িকা।

তারকা চিহ্ন শুধু অঙ্গেই শোভা পায়নি। লেখাপড়ার কৃতিত্বের জন্যও ওঁর খাতায় আছে তারকা চিহ্ন। ওঁর শিশুজীবনের বিদ্যাপীঠ ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুলের নিয়ম ছিল, যে মেয়ে লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবে তার প্রমোশন কার্ডে থাকবে তারকা চিহ্ন। ক্লাশ সেভেন-এর প্রমোশন কার্ডে দুটো সোনার তারকা চিহ্ন থাকায় মায়া দে-র এক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ক্লাস নাইনে প্রমোশন। ম্যাট্রিকে প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে ভূগোলে লেটার। আই-এ এবং বি-এ পাস প্রাইভেট পরীক্ষার্থীনী হিসাবে এবং কৃতিত্বের সঙ্গে।

ক্রীড়াপটু মেয়ে বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না। বলা উচিত খেলাপ্রিয় মেয়ে। তার চেয়েও জুৎসই কথা হবে খেলাধূলার পোক্ত পরিচালিকা। ব্যবহারিক শিক্ষা, পুঁথিগত বিদ্যা এবং হাতে কলমে কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঙলার স্বানামধন্যা ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস।

যখন বেথুন কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস ছিলেন তখন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত উপর্যুপরি ৪ বছর উইমেনস স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত কলেজ স্পোর্টসে বেথুন কলেজ চ্যাম্পিয়ান। যখন বেথুন কলেজ থেকে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে গেলেন তখন ১৯৪৮সাল থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত উপর্যুপরি ছ' বছর চ্যাম্পিয়ন লেডি ব্রাবোর্ন। সুতরাং পরিচালনার কৃতিত্ব আছে বৈকি। লেডি ব্রাবোর্ন থেকে মায়া দে আবার ফিরে এসেছেন বেথুনে।

নিজে সবরকমের খেলাধুলা করেছেন। সাঁতারের কথা আগেই বলেছি। টেনিকোয়েট, ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস সব কিছুতেই কিছু কিছু দখল আছে। স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় হাউস সিস্টেমের খেলায় টেনিকোয়েটের বিজয়িনী ও ব্যাস্কেটবলে

চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দলের অন্যতমা। এবং বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করেই ক্রীড়াজীবনের সূচনা।

১৯৩৬ সাল। ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে লা'মার্টিনার স্কুলকে হারিয়ে ইউনাইটেড মিশানারী স্কুলের যে টিম বাস্কেটবলের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ পায় মায়া দে ছিলেন সেই দলের খালি পায়ের সবচেয়ে খ্যাতনাম্নী মেয়ে। মায়া দে-র খেলার উন্নত ছলাকলা দেখে মিস বার্টন ওকে তাঁর ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দিতে আহ্বান করেন। মিস বার্টন ছিলেন বাঙ্গলা সরকারের মেয়ে স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে মেয়েদের খেলাধূলার চর্চার জন্য প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। মায়া দে প্রথম গ্রেডের ডিপ্লোমা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস হিসেবে চাকরি নেন বেথুন কলেজ স্কুলে। ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম গ্রুপের আর তিনজন বাঙালী মেয়ের মধ্যে হেমলতা সরকার একজন ইংরেজকে বিয়ে করে খেলাধূলার চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন, সরলা চক্রবর্তী এখন ইউনিভারসিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেডি হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাধনা বসু জলপাইগুড়ি স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট হেড মিস্ট্রেস।

ডিপ্লোমা কোর্সে ওদের পড়তে হয়েছে—(১) থিওরী অব.গেমস, (২) থিওরী অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৩) থিওরী অব সুইমিং, (৪) হিস্ট্রি অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৫) অ্যানাটমি ও (৬) হাইজিন। হাতে কলমে করতে হয়েছে জিমন্যাস্টিকস, মাইনর ও মেজর গেমস, অ্যাথলেটিক, সুইমিং, ধনুর্বিদ্যা ও ফার্স্ট এড।

এ তো গেল খেলার কথা। ১৯৪৯ সালে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের কাছে যখন প্রথম ডাক এল তখন আর দুটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে মায়া দে সাড়া দিলেন সে ডাকে। অপর দু'জন ইন্দিরা দত্ত ও নীলিমা সিংহ। ইন্দিরা দত্ত

এখন লেডি ব্রাবোর্নের ফিলসফির অধ্যাপিকা, নীলিমা সিংহ ঐ কলেজেরই বোটানীর ডিমনেস্ট্রেটর।

দিল্লিতে আরম্ভ হল আবার শিক্ষা। এবার লড়াইয়ের কাজকর্ম। বন্দুক চালনা, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, স্কোয়াড ড্রিল, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পরিচালনা। ওয়ারলেস আপারেটিং, সাংকেতিক পরিভাষা শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালে রোগীদের শয্যা পাতা পর্যন্ত।

তারপর মায়া দে এন সি সি-র কত ক্যাম্প পরিচালন করেছেন, কত প্যারেড চালিত করেছেন তার হিসাব নিকাশ নেই। বাঙলার বাইগাছি, রাঁচির দীপাতলী, দার্জিলিং-এর দরবার হল, নামকুম, ব্যারাকপুর, আগ্রা যেখানেই এন সি সি-র বার্ষিক শিবির বসেছে সেখানেই মায়া দে মেয়েদের কম্যাণ্ডার। তিন শো থেকে পাঁচশ মেয়ের পরিচালনার ভার ওঁর উপর। এবং পোক্ত পরিচালিকা হিসাবে সর্বত্রই সুনাম। শুধু গত বছর রামগড় ক্যাম্পে উনি যোগ দেননি। কে জানে, ওঁর অনুপস্থিতির ফলেই রামগড় মহিলা সমর শিক্ষার্থীদের ক্যাম্প জীবনের এক কালো অভিজ্ঞতা কি না!

ক্যাম্প কম্যাণ্ডার হিসাবে যোগ্যতার পুরস্কারও পেয়েছেন মায়া দে। ১৯৫৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে ১৫ দিনের জন্য এন সি সি-র যে ক্যাম্প বসেছিল, সেই ক্যাম্পে সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে বাঙলা দল পায় শ্রেষ্ঠ দলের 'ব্যানার'। ছেলে মেয়েদের চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের যাচাইয়ের পর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত বাঙ্গলা আর এই 'ব্যানার' ঘরে আনতে পারেননি, এক মায়া দে ছাড়া।

হুগলীর মেয়ে। পাণ্ডুয়ার কাছাকাছি গজিনা দাসপুর পৈত্রিক বাড়ি। বাবা ছিলেন যোগব্রত দে। বাবার মৃত্যুর পর মা শিক্ষিকার চাকরী নেন বর্ধমান মিশনারী গার্লস স্কুলে। কিন্তু মায়া দে-র স্কুল জীবনের সূচনা হয় কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা ইউনাইটেড

মিশনারী গার্লস স্কুলে। এখন বিধবা মা ও স্বামী অনন্তকুমার গাঙ্গুলীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার।

খেলাধূলাই জীবনের প্রধান ব্রত। নিজের জীবনের মতই মনে করেন খেলা ধূলায় বড় হবার জন্য সাধনা ও সংযম একান্ত প্রয়োজন।

মায়া দে-র মতে কলেজেই হোক, স্কুলেই হোক আর ক্লাবেই হোক, যদি উপর থেকে আরম্ভ করে নীচে পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি খেলাধূলাকে হৃদয় দিয়ে ভাল না বাসে তবে সে প্রতিষ্ঠানের কোন বড় সাফল্য সম্ভব নয়।

মৃত্যুর-সাথে পাঞ্জা



ডাক্তার গীতা চন্দ

১৯৫২ সালের জানুয়ারীর এক অপরাহ্ণ। ভারতীয় বিমান বাহিনীর আন্তঃ কম্যাণ্ড খেলাধূলার আয়োজনের অঙ্গ হিসাবে মোহন-বাগানের সঙ্গে বিমানবাহিনীর খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী হকি খেলা। ইডেন গার্ডেন লোকে লোকারণ্য। কলকাতার হকি খেলার ইতিহাসে মানুষের এত ভীড় আর কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অত বড় গোল মাঠের সব দিকেই মানুষের কালো মাথা। ছেলেবুড়ো, মেয়ে পুরুষ, কাচ্চাবাচ্চার ভীড়। কি এক আকর্ষণে যেন 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।'

কিন্তু শির কারোই আনত নয়। সবাই উর্ধ্বমুখী। খেলার আয়োজন মাটির বুকে কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার মানুষের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার চোখের দৃষ্টি উপরের দিকে।

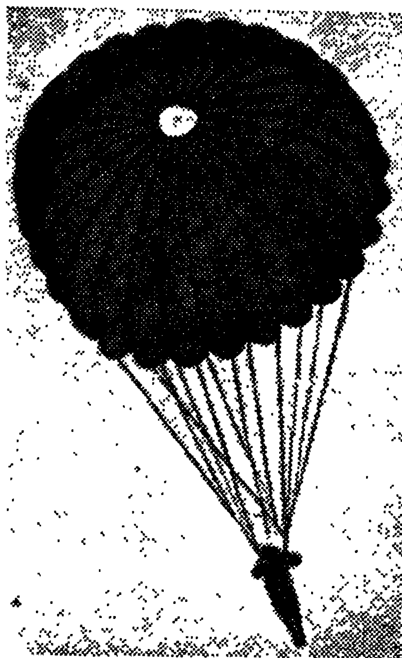
কারণ খেলাটাই সেদিনের বড় আকর্ষণ ছিল না। বিমান বাহিনীর খেলোয়াড়দের হাওয়াই জাহাজ থেকে প্যারাসুটযোগে মাঠে অবতরণের দৃশ্যটাই ছিল দর্শনীয় বস্তু। সে আরও বড় খেলা, একেবারে নতুন খেলাও বটে।

খেলা ছাড়া কি? প্রায় পাঁচশ ফুট উপরে উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে এক একজন খেলোয়াড় শূন্যের বুকে লাফিয়ে পড়ছে আর

প্যারাস্যুটের দড়ি টেনে, দেহটা হেলিয়ে দুলিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে ঠিক মাঠের মধ্যে এসে নেমে পড়ছে হকি স্টিক হাতে করে।

হাওয়ার বেগে প্যারাস্যুট এক একবার বিপথগামী হবার উপক্রম ; কিন্তু হাত আর দেহের এমনই কেরামতি যে একজনও ইডেন গার্ডনের বাইরে বেরিয়ে গেল না, সবাই এসে নামল ক্রীড়াঙ্গনের চৌহদ্দির মধ্যে একে একে।

যে কারণে মোটর রেসিং স্পোর্টস, বিমান চালনা বিগার স্পোর্টস, সে কারণে প্যারাস্যুট জাম্পিংও স্পোর্টস। সারাভারতে এ বিদ্যার অধিকারী খুব বেশী নেই। আর মেয়ে মাত্র একজন। আমাদের গর্ব সে একজন বাঙালী। নাম কুমারী গীতা চন্দ।



ডাক্তার গীতা চন্দের প্যারাস্যুট যোগে অবতরণের দৃশ্য

সামরিক জীবন। কিন্তু সেবা ধর্ম। কেননা গীতা চন্দ প্যারাট্রুপার ট্রেনিং স্কুলের মেডিক্যাল অফিসার। ক্যাম্পবেল থেকে (এখন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) এল এম এফ এবং কনডেন্সড কোর্সে মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি, বি এস পাশ করবার পর ১৯৫৭ সালে গীতা চন্দ যোগ দেন আর্মি মেডিক্যাল কোরে। সেখান থেকে প্যারাট্রুপার বাহিনীতে। প্রথম ছিলেন ফ্লাইং অফিসার। এখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

আদি বাড়ী কুমিল্লায়। শৈশব কেটেছে রংপুরে। বাবা হরেন্দ্র চন্দ্র চন্দ প্রথমে ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইতিহাসের

অধ্যাপক, পরে কলেজের অধ্যক্ষ। এখন কলকাতার চিকিৎসক। ৬৫।এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোডে তাঁর চিকিৎসালয়।

নিজে কৃতি পুরুষ। ছেলে-মেয়েদেরও মনের মত করে মানুষ করেছেন। তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যার মধ্যে সবাই গ্রাজুয়েট। এর মধ্যে আবার ৩ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট। বড় পুত্রবধূকে ধরলে সংসারে মেডিক্যাল গ্রজুয়েটের সংখ্যা চার। বড় ছেলে অমিয় চন্দ পুত্রবধূ কমলা চন্দ, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট গীতা চন্দ ও পম্পা চন্দ, সবারই এম বি ডিগ্রী। দ্বিতীয় পুত্র সন্তোষ চন্দ ইঞ্জিনীয়ার। ছোট মেয়ে মনীষা পশ্চিম জার্মানী গিয়েছেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। ছোট ছেলে দীপক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে ইংলণ্ডে যাবার জন্য তল্পিতল্পা বাঁধছে। সুতরাং ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের পরিবার।

পরিণত বয়সে হরেনবাবু পূর্ণ কর্মক্ষম। পুত্র কন্যার কৃতিত্বে পরিপূর্ণ সুখী। বিশেষ করে গীতা চন্দের জন্য। কিন্তু ডানপিটে মেয়ের জন্য আজ গর্ববোধ করলেও হরেনবাবু পরিষ্কার ভাবে বললেন —'আমি আগে জানলে কিছুতেই গীতাকে প্যারাট্রুপ বাহিনীতে যোগ দিতে দিতাম না। কে চায় তার মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে? গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্বত, দুস্তর মরুভূমি, যেখানে যানবাহন চলাচলের উপায় নেই সেখানেই তো সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য প্যারাট্রুপারের প্রয়োজন। এতে কত বিপদাশঙ্কা, কত ঝুকি, বিশেষ করে একটি মেয়ের পক্ষে।'

ডানপিঠে গীতা চন্দ ছোটবেলা থেকেই। বাবা বলেন, ছোট-বেলায় গাছে ওঠা, সাইকেল চালনা এবং খেলাধূলায় আমার ছেলেরাও ওর সঙ্গে পেরে ওঠেনি। আজও টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টন অবসর সময়ে ওর প্রিয় খেলা।

সামরিক জীবন, কঠিন দায়িত্ব, চারিদিকের রুক্ষ পরিবেশ, তাই বলে নারীত্বের মাধুর্য কিন্তু এতটুকু ম্লান হয়নি গীতা চন্দের। দেখলে

মনে হবে আপনার আমার ঘরের মেয়ে। অতি সাধারণ, অতি সাদাসিধে।

প্যারাট্রুপার বাহিনীতে যোগদান এবং ট্রেনিং সম্বন্ধে গীতা চন্দের কথা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক :

'আজকে এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করে প্রতি মুহূর্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে। অজনাকে জেনে অচেনাকে চিনতে পেরে ও দুরূহকে সহজ করে নিয়ে মানুষ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রাপথে অসংখ্য মানুষের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম অবদানগুলো চিরস্মরণীয় না হলেও ক্ষণিকের জন্য হয়তো মানুষের মনে বিস্ময় ও প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

যা বহুদিন ধরে অসম্ভাব্য বলে বিবেচিত হত তা যখন কারও চেষ্টায় বাস্তবে পরিণত হয় তখনই দুর্বল মানুষ ফিরে পায় অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস। সে তার দুর্জয় শক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আত্মশক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং নবপ্রেরণাকে আশ্রয় করে সে কঠিনতম কর্তব্যের সম্মুখীন হতে সাহস পায়।

মানব সমাজকে সুষ্ঠতর করে তোলবার চেষ্টায় প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার আছে। মিথ্যা দম্ভে বা গৌরবার্জনের মোহে অন্ধ হয়ে কাউকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে মানুষের এই প্রগতিকে শুধু পেছনের দিকেই টানা হবে। শুধু তাই নয় আজকের দিনে স্ত্রীপুরুষ সবাকেই সমানভাবে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই আমার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা আমাকে এক অপূর্ব সুযোগের স্বরূপ চিনে নিতে সাহায্য করেছে।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি ডাক্তার হিসাবে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগদান করি। অল্প কিছুদিন আগে থেকে বিমান বাহিনীতে মহিলাদের একমাত্র ডাক্তারী বিভাগে কমিশন

দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যারা স্ত্রীজাতির এই সমান অধিকারের স্বীকৃতিকে মর্যাদা দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা বিমান-বাহিনীতে খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কালক্রমে এটাও খুব স্বাভাবিক বলেই লোকে ধরে নেয়।

কমিশন পাবার কিছুকাল পরেই আমাকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়। এইখানে এসেই বিমানবাহিনীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পাই। বলা বাহুল্য, দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত বিমানবাহিনীর কর্মবীররা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। এই আয়োজনে নিজেকে সম্পুর্ণভাবে পূর্ণ করব, এমন বাসনা আমার জাগে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিমানবাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে প্রেরণা পাই। তারপর কোন এক শুভমুহূর্তে যখন আমার মনোবাসনা পূর্ণ করার সুযোগ এল তাকে নির্ভয়ে বিপুল উৎসাহে সাদরে গ্রহণ করে নিতে কৃতসংকল্প হলাম।

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে বিমানবাহিনীর ডাক্তারদের প্যারাট্রুপার হবার আহ্বান জানিয়ে সার্কুলার পাঠান হয় সব স্টেশনে। সেই আহ্বান আমার এখানেও আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এবং স্বেচ্ছায় সে ডাকে সাড়া দিই। কিন্তু আমার অন্যান্য সহকর্মী ডাক্তারদের নামের পাশে নিজস্ব হস্তাক্ষরে অসম্মতি জানানোর পর যখন আমাকে ওই সার্কুলারটা পাঠানো হয় "not applicable" লেখবার জন্য তখন খুবই আশ্চর্য হই। খানিকটা অপমানিতও বোধ করি। এটাতে অসম্মতি জানিয়ে আমি যখন প্যারাট্রুপিংএ যাবার বাসনা প্রকাশ করি তখন অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন! প্যারাট্রুপিং নাকি ষণ্ডামার্কা সিপাইদের পক্ষেই সম্ভব। তাই আমার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফল প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাদপসরণের জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না সেদিন। আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি তাঁদের সবাইকে। কারণ এঁদের মনোভাবই হয়তো আমার সংকল্পকে শতগুণে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। প্রথমত স্বভাবজনিত মানসিক দুর্বলতায় যতটুকু

ভয় বা দ্বিধা ছিল তাও যেন কোথায় উবে গেল। মনের গোপন কোনের দৃঢ়তা সব সময় আমায় সাহায্য যোগাত। আমার দৃঢ়সংকল্পে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ফলে কোর্সের জন্য আমার নাম উপরে পাঠান হল। সৌভাগ্যক্রমে বিমান-বাহিনীর সদর দপ্তরে তৎকালীন অধিনায়ক স্বর্গীয় এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি আমার এই দৃঢ়-সংকল্পকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সমাদর দিলেন।

কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মি ও হিতৈষী-বন্ধুর বিপুল উৎসাহ ও স্বীয় মনোবলকে পাথেয় করে পারাট্রুপার ট্রেনিং স্কুলে যোগদান করলাম ১৯৫৯ সালের ১৪ই মে।

উত্তর ভারতের সর্বজনবিদিত গ্রীষ্মের প্রখরতায় ১৫ই মে থেকে শুরু হল ট্রেনিংয়ের অধ্যায়। বর্ষার উপদ্রব প্যারাট্রুপার স্কুলের ট্রেনিং চালাবার প্রতিকূল। তাই প্রতিবছর বর্ষাকালে শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটলো। একমাত্র শিক্ষানবীশ হিসাবে আমাকে নেওয়া হল।

প্যারাট্রুপার হবার জন্য প্রথম প্রয়োজন দৈহিক সবলতা ও কঠোর পরিশ্রম। প্যারাট্রুপারদের প্রায়ই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই দৈহিক জড়তাকে দূর করে সবল ও সুস্থ দেহমন গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে প্রথম দেড়মাসব্যাপী চললো পি টি প্যারেড প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার পালা।

রোজ সকালে দীর্ঘ মাইল পাঁচেক দৌড়ে তারপর পি টি ও প্যারেড করবার কল্পনা করাই হয়তো আমার পক্ষে দুরূহ ছিল। কিন্তু তাও সম্ভব হল। প্রথমদিকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়তাম, সন্দেহ হত শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবো কিনা—কিন্তু instructorদের একটা বিপুল উৎসাহ আমাকে এই সাময়িক দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছে। অধ্যবসায় ও দৃঢ়সংকল্পের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এগুলোকে সহজ বলেই মেনে নিতে শিখলাম। দেড় মাস পর সুরু

হল প্যারাট্রুপিং কলাকৌশল আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রাউণ্ড ট্রেনিং। প্যারাস্যুটের সাহায্যে বায়ুপথে অবতরণকালে যেসব কলাকৌশল প্যারাট্রুপারকে করতে হয় তারই সঙ্গে পরিচয় হয় এই সময়।

আকাশপথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে বিশেষ ভঙ্গিমায় রেখে প্যারাস্যুটকে আয়ত্তে রাখার বিশেষ কলাকৌশল এবং সর্বশেষে নিরাপদ স্থানে অবতরণ করার জন্য বিভিন্ন কার্য পদ্ধতি বিষদভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তারই অনুশীলন করে যেতে হয় বার বার।

১৭ই জুলাই ১৯৫৯ সাল। ডাকোটার উন্মুক্ত দ্বারে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে দেখতে পেলাম আমার লাফ দেখবার বাসনায় বিপুল জনসমাবেশ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোবল শতগুণে বেড়ে গেল। শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম সবুজ আলোর সঙ্কেতেই লাফিয়ে পড়বার জন্য। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন প্যারাট্রুপার জাম্পিং ইনস্ট্রাকটর। ওরা লাফ দেবার পর আমার পালা। সুতরাং ভয় কিসের? সত্যি তাই হল—এক এক করে সব ইনস্ট্রাকটররা অন্তর্হিত হবার পর নির্দিষ্ট সময়ে আমিও উড়ন্ত প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়লাম শূন্যের বুকে। দু'চার সেকেণ্ডের জন্য সব যেন নিশ্চল হয়ে গেল। দেহমন এমন কি চিন্তাশক্তিও যেন তাদের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ যেন জেগে উঠলাম,—প্যারাস্যুটের টানে। বোধশক্তিও ফিরে পেলাম। ওপরে চেয়ে দেখলাম প্যারাস্যুট্ পূর্ণমাত্রায় স্ফীত হয়ে বায়ুপথে দেহের অধোগতিকে মন্থর করেছে। এক হাজার ফুট থেকে জাম্প করে প্রায় কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যেই ভূ-পৃষ্টের জিনিসগুলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর দেখতে পেলাম। আর কানে এলো মাটি থেকে আমার উদ্দেশে জনৈক Parachute jumping instructor এর নির্দেশাবলী। চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই খুব নীচে এসে নামবার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিলাম। সুষ্ঠুভাবে ল্যাণ্ডিং হয়ে যাবার পর আরম্ভ হল অভিনন্দনের পালা। অগণিত লোকের একই প্রশ্ন 'কেমন লাগলো'? এক মিনিটের কম হলেও এই অল্প সময়ের

অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করতে গিয়ে আদি বা অন্ত খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া জবাব দেবার সময় কোথায়? হাসিমুখে ধন্যবাদ জানাবার সময়টুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছিল এরা।

তারপর দ্বিতীয় জাম্প। ২৫শে জুলাই। সেদিন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের আগমনে জনসমাগম আরোও বেশী।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাজনিত বিপুল আত্মনির্ভরতাকে সম্বল করে বিনা দ্বিধায় জাম্প-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। জাম্প হল কিন্তু এবার দেখা দিল এক সমস্যা। সাংঘাতিকভাবে টুইস্টেড হয়ে প্যারাসুট্‌টা নামছে। দড়িতে দড়িতে গেছে জট পাকিয়ে। তাই ক্ষিপ্রগতিতে নির্দেশানুযায়ী পদ্ধতিতে প্যারাসুট্‌টা আয়ত্তে এনে ল্যাণ্ড করলাম।

এমনি করে একে একে সাতটা জাম্প। একটা আবার রাত্রে।

কোর্স শেষ হবার পর এলো আর একটি স্মরণীয় দিন ১৮ই আগস্ট ১৯৫৯ সাল। সেদিন আমাকে আমার প্যারাট্রুপারের ব্যাজ দেওয়া হয়। স্বর্গীয় এয়র মার্শাল সুব্রত মুখার্জি স্বয়ং এসেছিলেন আমাকে এই সম্মানের অধিকারিণী করতে। সেদিন আমার স্যালুট নেবার সময় তাঁর চোখে-মুখে যে অপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল জ্যোতির আভাস দেখতে পেয়েছিলাম তা কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। আজ তাঁর মৃত আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এরপর শত শত অভিনন্দনের চিঠি ও তারবার্তা পেয়েছি। তার মধ্যে দুটো তারবার্তা আমাকে খুবই অভিভূত করেছে। একটি হচ্ছে ভারতের সর্বপ্রথম প্যারাট্রুপার ডাক্তার কর্ণেল রঙ্গরাজের, দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় স্কোয়াড্রন লীডার শৈলকুমার চ্যাটার্জির।

প্যারাসুট্ জাম্পার হয়ে আমি সুখী হয়েছি। আরও সুখী হব যদি আমার বাঙালী বোনেরা এ কাজে এগিয়ে আসেন।”

পথ নির্দেশ



পূর্ণা ঘোষ (রায় চৌধুরী)

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগের কথা। দু'টি বাঙালী মেয়ের ছবি তখন কাগজের পাতায় পাতায়। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, দীপালি, খেয়ালী, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান, অ্যাডভান্স প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টালেই মাঝে মাঝে চোখে পড়তো এই দুটি মেয়ের ছবি। রাশি রাশি কাপ মেডেলের পাশে বসে দুজনেই হাসছে।

একজনের কৃতিত্ব জলে। আর একজনের স্থলে। জলের বুকে কলতান তুলেছিল যে মেয়েটি তার কথা আগেই লেখা হয়ে গেছে। তার নাম বাণী ঘোষ। আজ লিখছি পূর্ণা ঘোষের কথা, অ্যাথলেটি-কসের অসাধারণ দক্ষতায় যে মাটির বুকে ধূলি উড়িয়েছে। পথ নির্দেশ করেছে পরের বাঙালী মেয়েদের।

বাঙলার অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে পূর্ণা ঘোষকে প্রথম বরনীয়া বাঙালী মেয়ের কৃতিত্ব দিলে কারো তরফ থেকেই আপত্তি উঠবার কথা নয়। কারণ অ্যাথলেটিকসে বাঙালীর শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে পূর্ণা ঘোষ। শুধু শূন্য স্থানই পূর্ণ করেনি। তখনকার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদেরও অনেক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত করেছে এই মেয়েটি।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত 'ফাস্টেস্ট স্কুল গার্ল' নামে খ্যাতি তো ছিলই. তাছাড়া মোহনবাগান স্পোর্টস, ক্রাউন স্পোর্টস, বেঙ্গল অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বয়েজ ইউনিয়ন স্পোর্টস, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি যায়গার বাঙালী প্রধান স্পোর্টসের ৫০ গজ, ৭৫ গজ ও ১০০ গজ দৌড়ে পূর্ণার প্রথম স্থান ছিল বাঁধা। তখনকার দিনের নামকরা এবং আভিজাত্যে ভরা কালীঘাট স্পোর্টসে, বাঙালী মেয়ের যোগদানের অধিকার ছিল না। অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে 'মানের' এত পার্থক্য ছিল যে বাঙালীর যোগ দেবার প্রশ্নই উঠতো না। পূর্ণা ঘোষই প্রথম বাঙালী মেয়ে যে আপন কৃতিত্বে দৌড়পটু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও নিজের যায়গা করে নিয়েছিল। পূর্ণাই প্রথম বাঙালী যার পায়ে সর্বপ্রথম উঠেছিল রানিং স্থ।

১৪ নম্বর গোয়াবাগান স্ট্রীটের বিপিনবিহারী ঘোষের মেয়ে। তবে অ্যাথলেটিকসের ক্ষেত্রে পূর্ণা ঘোষকে নিজ হাতে গড়ে পিঠে মানুষ করেছেন জাতীয় যুব সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক অনিল বিশ্বাস। হেদোর সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে প্রথম অনুশীলন। পরে প্রাঙ্গণের পেছনের রাস্তায়, শেষে গড়ের মাঠের গ্রীয়ার ক্লাবে দৌড়ের উন্নত শিক্ষা।

তখনকার দিনে রাস্তায় এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না। মানুষের ভিড়ও কম ছিল। সুতরাং সকালের দিকে স্কটিশ চার্চ কলেজের পশ্চিম আর হেদোর পূর্বদিকের ঐ রাস্তায় অনুশীলনের অসুবিধা থাকবার কথা নয়। ওখানকার অনুশীলনেই অনেকখানি পটু হয়েছিল পূর্ণা ঘোষ। পোক্ত হয়েছিল ময়দানের অনুশীলনে।

দৌড় ছাড়া লাঠি খেলা, ছোরা খেলাতেও ভাল হাত ছিল পূর্ণা ঘোষের। তবে সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ১৯৩৫-এর পরে গতিবেগও মন্থর হয়ে আসে। ফলে খেলাধূলা ছেড়ে পড়াশুনা নিয়ে মেতে ওঠে পূর্ণা। ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পাস। ১৯৪৮-এ সংসার সমুদ্রে প্রবেশ।

পূর্ণা ঘোষ এখন পূর্ণা রায়চৌধুরী। খুলনা জেলার খলিসা-খালির অধীর কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী। বর্তমানে ৮ নম্বর রামতনু বসু লেনে নিজেদের বাড়ি। স্বামী মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্মী।

তিনটি মেয়ের জননী। তবে পূর্ণা রায়চৌধুরীর দুঃখ মেয়েদের কারোই খেলাধূলার দিকে মন নেই। পিতৃকুল এবং শ্বশুর কুলেও খেলাধূলায় পরিচয় দেবার মত নাম কম। এক সুবীর ঘোষ ছাড়া আর কেউ খেলাধূলায় নাম করেনি। ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় ও সাঁতারু সুবীর পূর্ণা রায়চৌধুরীর ছোট ভাই।

খেলার মাঠ থেকে পূর্ণা ঘোষ হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে। আর অ্যাথলেটিকসের আজকের অনুরাগীদের কাছে পূর্ণা রায়চৌধুরী একেবারেই অপরিচিত।

খোঁজ পাচ্ছিলাম না আমিও। খোঁজখবর নিয়ে বাড়ির 'লোকেশানের' একটা আন্দাজ পেলাম। রামতনু বসু লেনের ৮ নম্বরের সামনে গিয়ে দেখি উঁচু ভিতের পর বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি কিছুটা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এটাই পূর্ণা রায়চৌধুরীদের বাড়ি।

খবর পেয়ে আভিজাত্য ভুলে ছুটে এলেন ছোট বেলায় মাঠে ছোটার মত আগ্রহ নিয়ে। স্পোর্টস সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হতেই ফিরে গেলেন স্বপ্নরঙীন শিশু জীবনে। যেন হারানো দিন হাতে পেয়েছেন। কতরকমের প্রশ্ন। তারপর স্পোর্টস পরিচালকদের কুশল জিজ্ঞাসা।

—বলাই দা কেমন আছেন? আপনাদের বলাই চ্যাটার্জি।

—ভাল আছেন, এখনো আগের মত মন হাল্কা, তবে দেহ ভারী। আপনার সঙ্গে যে ছবি আছে তার সঙ্গে কোনই মিল নেই।

—ব্রজদা এখনো আনন্দবাজারে আছেন? বড় ভালবাসতেন

আমাকে। আমার জন্য অনেক লিখেছেন, অনেক ছবি ছেপেছেন আনন্দবাজারে।

—ব্রজদা আনন্দবাজারেই আছেন। তিনিই তো আমাদের গুরু। সম্প্রতি পড়ে গিয়ে তাঁর ডান হাত ভেঙ্গে গেছে।

—পরিতোষবাবু কেমন আছেন?

—আর ইহলোকে নেই—

—আচ্ছা মোহনবাগানের জে কে দেব, যিনি রিভলবার ছুড়ে স্পোর্টসের স্টার্ট দিতেন?

—তিনিও জীবনের অপর পারে।

—নকি আমেদ?

—পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর খবর পাইনি।

—আবু ইউসুফ?

—ক্যালকাটা পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়েছিলেন। এখন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

বিশুদা (বিশু বসু) মারা গিয়েছেন সে খবর জানি। আচ্ছা, ফটোগ্রাফারদের মধ্যে কে কে এখনো কাজ করছেন? কাঞ্চন মুখার্জি, জে কে সান্যাল, বীরেন সিংহ, মিঃ চাম্পাটি—এরা সব কোথায়? ঐ ছবিটা চাম্পাটিবাবুর তোলা। আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। ওটা কাঞ্চনবাবুর, স্টেটসম্যানের হার্ট সাহেবও আমাদের অনেক ছবি তুলতেন, আর তুলতেন অ্যাডভান্সের ভুলো সেন।

—বললাম কাঞ্চন মুখার্জি বহুদিন আগে প্রোসেস ডিপার্টমেণ্ট খুলেছেন। ভালই আছেন। ক্যামেরা এখনো জে কে স্যানালের সদা সঙ্গী। বীরেন দা 'নন্দাঘুন্টি' জয় করে 'মানা' থেকে ফিরে এসেছেন। মিঃ চাম্পাটি আগের মত এখনো মিঃ প্যাকাটি। ফু দিলে উড়ে যান। হার্ট সাহেবের খবর জানি না। ভুলো সেন

অনেকদিন আগে সংসারের মায়া কাটিয়েছেন। ছবি তোলাই ছিল যার কাজ তার ছবি আজ কারো মনে আঁকা নেই।

পূর্ণা রায়চৌধুরীর সঙ্গে স্পোর্টস সম্পর্কে আরও আলোচনার পর যখন বেরিয়ে এলাম, মনে হল পূর্ণা রায়চৌধুরীর ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন বুঝি ভেঙ্গে গেল।

'মেকনপ সিস্'—এর মেয়ে



প্রীতি বসু (মিত্র)

'ব্যাডমিণ্টন'। অভিধান খুলে অর্থ খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে—এক রকমের খেলা। যার উপকরণ নেট, ব্যাট, সাট্‌লকক। পাখীর পালক ও কর্ক দিয়ে তৈরী লম্বা ধরনের বল, ঠিক যেন একটি শিমুল ফুল। ব্যাটমিণ্টন নাম হলে তবু অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু ব্যাড-মিণ্টন নাম হল কেন? প্রশ্নটি অনেকের মনেই খোঁচা মারে।

অনেকদিন আগের কথা। বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের এক স্মারক পুস্তিকায় এক বিখ্যাত কার্টুনিস্টের আঁকা একখানা ছবি চোখে পড়েছিল। ছবিখানির বিষয়বস্তু: বাতাসের দোলায় শিমুল গাছ থেকে একটি ফুল ঝরে পড়েছে, মাটিতে পড়বার আগে একটি ছেলে একটু চওড়া কাঠ দিয়ে ফুলের গায়ে আঘাত করল, ফুল উঠল আবার উপরের দিকে। পড়বার মুখে ফুলের বোঁটার ভারী দিকটা ছিল নিচের দিকে, পাপড়ি উপরে; উপরে উঠবার মুখে বোঁটার দিকটা উপরের দিকে, পাপড়ি নিম্নমুখী। কৌতূহল বশে ছেলেটি ফুলের গায়ে আবার আঘাত করল, আবার ফুল উঠল উপরের দিকে। যতবারই আঘাত করে পাপড়িতে আঁচ লাগে না, নিচের ভারী দিকটায় আঘাত লাগে আর ফুল বেশ গতি নিয়েই উপরে

ওঠে। বাঃ বেশ মজা তো! তারপর দু'টি ছেলে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে একটি দড়ি বাঁধল, দড়ির আর এক মুখ বাঁধল একটু দূরে একটি খুঁটির সঙ্গে। দু'দিকে দু'জন দাঁড়িয়ে কাঠ দিয়ে শিমুল ফুল মারামারি করতে আরম্ভ করল, একবার ফুল এদিকে, একবার ওদিকে।

এই চিত্র থেকে কার্টুনিস্ট ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তির আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হয়তো সত্যি, হয়তো সত্যি না। ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তির মূলে এ ধরনের উদ্ভাবনী মন অস্বীকার করাও যায় না!

তবে ভারতবর্ষই যে ব্যাডমিণ্টনের মাতৃভূমি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খেলাধূলার গবেষণার মধ্য দিয়েই তা জানা গেছে। কিন্তু খেলাটিকে যারা রূপে রসে ভরে তুলেছেন তারা কিন্তু ভারতবাসী নন।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে পুনার অধিবাসীরা পাখির পালকে তৈরী এই ধরণের একরকম বল ছোট ছোট ব্যাট দিয়ে পেটাপিটি করত। ইংরেজ সৈন্য-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মীরা খেলাটি দেখে খুব আকৃষ্ট হয়। 'পুনা গেমস' নাম দিয়ে ওখানেই তারা এ খেলার রেওয়াজ আরম্ভ করে। ইংরেজ সৈন্যদের ছুটির ফাঁকে ফাঁকে খেলাটি সাগর পারে চালান হয়। ১৮৭৩ সালে 'বোফার্টের' ডিউক কিছু কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। সেই সব সৈনিক ভোজে উপস্থিত হন যাদের কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। গ্লস্টারশায়ারে ডিউকের নিজের বাড়ির নাম ছিল 'ব্যাডমিণ্টন'। 'ব্যাডমিণ্টনে' খানাপিনার পর সৈনিকরা পুনা থেকে শেখা 'পুনা গেমস'-এর এক প্রদর্শনী দেখান। ডিউক নিজেও খেলায় খুব আকৃষ্ট হন। তারপর খেলাটি আস্তে আস্তে বেশ জনপ্রিয় হতে থাকে এবং খেলার নতুন নামকরণ হয় ব্যাডমিণ্টন।

খেলাধূলায় মেয়েদের কথা লিখতে এ মুখবন্ধের খুব প্রয়োজন

ছিল না। প্রয়োজন এই জন্যে যে, যে ভারতবর্ষ ব্যাডমিণ্টনের মাতৃভূমি সেই ভারতবর্ষের মেয়েরা ব্যাডমিণ্টন খেলায় অনেক পশ্চাতে। বাঙালী মেয়ের তো কথাই নেই। ১৯৩৫ সাল থেকে ব্যাডমিণ্টনে মেয়েদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তির খেলায় কোন বাঙালী মেয়ে বিজয়িনী হতে তো পারেইনি, বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিজয়িনী হয়েছে মাত্র ছ'টি মেয়ে। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রীতি বসু, ১৯৫৫-৫৬ সালে মীরা দাস। মেয়েদের ডাবলস অর্থাৎ জুড়ির খেলাতেও সাফল্য দুই জোড়ার বেশী নয়। ডাবলসে ১৯৪৬-৪৭ সালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন পূরবী ও কণা বসু, ১৯৫৪-৫৫ সালে মীরা দাস ও নীলিমা ঘোষ। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে আর সমস্ত বিজয়ীর সম্মান অবাঙালী ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের। পার্ল গস, বেটি ক্যাচিক, মিসেস বোলাণ্ড, ফিলিস কুক, শীলা ভার্মা, প্রেম পরাশর ডোরিন স্টিভেন্স প্রভৃতি প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আধিপত্যের মধ্যে ফ্রক পরা বাঙালী মেয়ে প্রীতি বসুর সর্বপ্রথম বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ শুধু বাঙালীর অযোগ্যতার অপবাদ দূর করেনি, বাঙলার ব্যাডমিণ্টনের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেও নথীভুক্ত হয়ে আছে।

উঁচু ছাতওয়ালা হলঘর, স্কুল-কলেজ-হোস্টেলে ও ক্লাবের প্রাঙ্গণ আর বড়লোকের বাড়ির বড় উঠোন—এই সমস্তই হচ্ছে কভার্ড কোর্টের অভাবে আমাদের দেশের ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। এখানেই খেলার অনুশীলন, এখানেই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

১৯৪৬ সালে বাগবাজার পশুপতি বসুর বাড়িতে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ফাইন্যাল খেলার দিন বেশ একটু সোরগোল। কেননা চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি বাঙ্গালী মেয়ে এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বিখ্যাত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় সুনীল বসুর তখন উঠতি সুনাম, দেশজোড়া

নামডাক। মিক্সড ডাবলস ফাইন্যালে মেয়েটি সুনীলের সঙ্গী। লেডিস ডাবলসের ফাইন্যালেও একই মেয়ে, পার্টনার তার ছোট বোন। একদিকে ছোট্ট দুই বাঙালী দুহিতা, অপরদিকে শ্বেতাঙ্গিনী মা ও কন্যা। গণ্যমান্য দর্শকের মধ্যে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট বর্ধমানের মহারাজা অধিরাজা, পুরস্কার বিতরণের জন্য তাঁর পাশে উপবিষ্টা মহারাণী অধিরাণী। দুই বোন প্রীতি ও নমিতা যখন ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট নিয়ে কোর্টে নামল তখন সবাই অবাক। একজনের বয়স এগারো বারো, একজনের নয় দশ।

দর্শকদের আনন্দের মধ্যে প্রীতি ফাইন্যালে স্ট্রেট সেটে হারাল ম্যাককরিকে। মিক্সড ডাবলসে সুনীল বসু ও প্রীতি বসু বিজয়িনী হল মনোজ গুহ ও নমিতা বসুর বিরুদ্ধে। প্রীতি পেল দ্বিমুকুট ত্রিমুকুটও পাবার সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু মা ও মেয়ে মিসেস ও মিস্ ম্যাককরির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা :করে প্রীতি ও নমিতা হেরে যাওয়ায় সেটা আর হয়ে উঠল না। অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার কাছে ওরা হেরে গেল। তবু বাঁধ ভাঙ্গল। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল একটি বাঙালী মেয়ে।

উত্তর প্রদেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে মিস ম্যাককরির বিরুদ্ধে প্রীতির খেলার স্মৃতি অনেকের মনে আঁকা রয়েছে। মিস ম্যাককরি ছিলেন ব্যাডমিণ্টনের সুপটু মেয়ে। পরের বছর ইনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং সেখানকার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন।

প্রীতির কাছে ম্যাককরি স্ট্রেট সেটে হেরে যাবে খেলার আগে একথা কেউ ভাবতেই পারেনি। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়শিপের আগে শোভাবাজার রাজ বাড়ির ব্যামিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ম্যাককরিই হারিয়েছিল প্রীতিকে। কিন্তু বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে প্রীতি চমৎকার খেলেছিল। যেমন ছিল তার স্ম্যাশিং

তেমন প্লেসিং। চটুল পদক্ষেপে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে খেলে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল।

অবশ্য প্রীতির একটু সুবিধা হয়েছিল অন্য কারণে। সে ছিল ন্যাটা খেলোয়াড়। বাঁ হাতের খেলোয়াড়ের সুবিধা অনেক। সাধারণত তার মার চালিত হয় প্রতিপক্ষের বাঁদিকে আর প্রতিপক্ষের মারও আসে তার বাঁদিকে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সব সময় মনে রাখতে হয় তার প্রতিপক্ষ ন্যাটা খেলোয়াড়। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে এইটুক মনে রেখে ঠিকভাবে স্ট্রোক করা খুবই শক্ত।

বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ছাড়া প্রীতি বসু ছোট বড় অনেক প্রতিগোগিতার বিজয়িনী আর বিজয়িনী একধিকবার দার্জিলিং-এর বিখ্যাত চাঁদমারী ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায়। কিন্তু বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে একবারের বেশী খেলার সুযোগ ঘটেনি। কারণ ওরা ছিল দার্জিলিং-এর স্থায়ী বাসিন্দা।

দার্জিলিং-এ বসবাসের ফলেই ব্যাডমিণ্টনে আসক্তি। ১৯৪৪ সালে দার্জিলিং-এ খেলতে যান জর্জ লুইস, দেবীন্দার মোহন ও কর্তার সিং—ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনের সব উজ্জ্বল নক্ষত্র। দার্জিলিং-এ সেই যে ব্যাডমিণ্টনের জোয়ার আসে তার ধারা আজও অব্যাহত। আজও এখানকার প্রতিযোগিতায় নেপালী, বাঙালী ও ফিরিঙ্গী মিলে কুড়ি-বাইশটি মেয়ে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রীড়াতীর্থ কলকাতায় পাঁচসাতটি মেয়ে পাওয়া ভার।

অবশ্য দার্জিলিং-এ ব্যাডমিণ্টন আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। প্রীতি বসু ও নমিতা বসুর মত পূরবী বসু, করবী বসু, কণা বসু প্রভৃতি ব্যাডমিণ্টনের খ্যাতনাম্নী যারা সবাই দার্জিলিং-এর মেয়ে। বসুদেরই জয়জয়াকার। এদিকে ছিলেন সুনীল বসু।

ব্যাডমিণ্টনে বসুদের প্রাধান্যের কথায় একটি গল্প মনে পড়ছে।

মেডিক্যাল কলেজের স্বনামধন্য এক ইউরোপীয় সার্জনের 'বসু'

পদবী সম্বন্ধে সুউচ্চ ধারণা ছিল। স্যার জগদীশ বসু, সুভাষ বসু, শরৎ বসু, প্রভৃতির বসু পদবীতে তাঁর ছিল অসম্ভব মোহ। তাই মেডিক্যাল কলেজের কোন ছাত্র তাঁর প্রশ্নের মনের মত উত্তর দিতে পারলে তিনি চীৎকার করে বলে উঠতেন—'তুমি কি কোন বসু পরিবারের ছেলে?'

যখনকার কথা বলছি তখন ব্যাডমিণ্টনে কোন মেয়েকে ভাল খেলতে দেখলেও মনে হত ও বুঝি বসু পরিবারভুক্ত।

দার্জিলিং-এর পর্দামুক্ত আবহাওয়ায় এবং উদারপন্থী ও ক্রীড়ানু-রাগী পিতার প্রশ্রয়ে প্রীতিদের ব্যাডমিণ্টনে অনুরাগ।

দার্জিলিং 'লয়েড বোটানিক গার্ডেন'-এর প্রথম ভারতীয় 'কিউরেটর' রায়সাহেব এস এন বসু নিজে জীবনভোর ব্যাডমিণ্টন খেলেছেন। এখনো খেলার আলোচনায় তাঁর অদম্য উৎসাহ। বোটানিক গার্ডেনের মধ্যেই ছিল তাঁর খেলার কোর্ট। অবসর-প্রাপ্ত জীবনে গুড রোডে নিজের বাড়িতেও তিনি এক কোর্ট তৈরি করে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলাধূলা আরম্ভ করেন।

বাড়িটির নাম 'মেকনপ্‌সিস্' (MECONOPSIS)—দুর্বোধ্য নাম। বোটানির কৃতী ছাত্র এবং স্যার জন এণ্ডারসন রক গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা এস এন বসু, যিনি সারা জীবনই গাছ, ফুল, লতা, গুল্মের গবেষণা করেছেন। তিনি বাড়ির নামকরণ করেছেন বোটানির পরিভাষায়। 'পপি' নামে একরকমের ফুল আছে। আট হাজার ফুট হাই 'আলটিচিউডে' ছাড়া এ ফুল জন্মায় না। কিন্তু রায় সাহেব দার্জিলিংয়ের ৭ হাজার ফুট উঁচুতেও ফুল ফুটিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই কৃতিত্বকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যেই পপির বোটানিক্যাল নাম 'মেকনপ্‌সিস্' হয়েছে বাড়ির নাম।

দুর্বোধ্য নাম দেখে পথচারীরা বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতো। আর চেয়ে থাকতো প্রীতিদের ব্যাডমিণ্টন খেলার দিকে। বাতিল বলে প্রথমে বোনে বোনে খেলা। পরে বাবার সঙ্গে রেওয়াজ। চার

বোনের মধ্যে তিনজনই খেলোয়াড়। প্রথমা রেণুকা, দ্বিতীয়া প্রীতি, তৃতীয়া নমিতা।

প্রীতি ও নমিতাকে পরে ব্যাডমিণ্টনে পটু করে তোলেন ওদের বেলতলা রোডের বাড়িতে ওদেরই সম্পর্কীয় ভাই বাঙলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মনোজ গুহ।

১৯৫১ সালে ডানকান ব্রাদার্সের কর্মী বিজলী মিত্রের সঙ্গে প্রীতি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের আগে থেকেই খেলায় প্রায় ছেদ পড়েছিল। বিয়ের পর একেবারেই বিচ্ছেদ। প্রীতি মিত্র এখন এক ছেলের মা। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হিসাবে আই এ পাশ করেছেন। বি এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

বাঙলার ব্যাডমিণ্টনে প্রথম বাঙালী হিসাবে বিজয়িনী হয়ে প্রীতি যেমন গতানুগতিকার বাঁধ ভেঙ্গেছেন তেমন ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনও তাকে দিয়েছে অনন্য সম্মান। প্রীতির চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের ১০ বছর পরে আর এক বাঙালী মেয়ে মীরা দাস যখন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেন তখন প্রীতির হাত থেকেই তাকে গ্রহণ করতে হল বিজয়িনীর পুরস্কার।

দুঃসাহসিকা



দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখলেই মনে হবে তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে আসছেন। এখনই শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা আবাহন করে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে বসবেন। অথচ উড়নচণ্ডী মেয়ে, সারা ভারতে প্রোফেশনাল লাইসেন্সধারী একমাত্র বিমান-চালিকা।

খেলাধূলায় মহিলা প্রসঙ্গের মধ্যে একজন পেশাদার বিমান-চালিকাকে কেন ডেকে আনলাম তার জন্য কিছু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিচক্রযানের প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত, মোটর-রেসিংও আন্তর্জাতিক স্পোর্টস হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিমানচালনার কোন প্রতিযোগিতা নেই। আর যদি থাকতোই, ট্যাক্সিড্রাইভার আর মোটর রেস করিয়েতে অনেক তফাৎ, দ্বিতীয় জন স্পোর্টসম্যান, প্রথমজন নয়।

তবু আমি দাবি করবো আমার আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতের একমাত্র মহিলা পেশাদার বিমানচালিকা কুমারী দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় অনধিকার প্রবেশ করছেন না। খেলাধূলার যে মূল মনোভাব : দেহ মনের সমন্বিত সঞ্চালন, প্রচলিত দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডী এড়িয়ে এক সাজানো রণক্ষেত্রের দৃশ্য অথবা অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর কমবেশি কিছু বিপদের ঝুঁকি—এ সবই আছে দুর্বা দেবীর

বিমানচালনাপ্রধান জীবনে। বাঘ শিকারও খেলা, গেম, একেবারে বিগ্ গেম। বিমানচালনা বিগার গেম, প্রতিদিন বিমান চালাতে চালাতে হয়তো তাতে যন্ত্রের সাবলীলতা এসে যায়, যেমন বাঘ শিকারও সহজ হয়ে যায় অনেক বাঘা বাঘা শিকারীর বেলায়।

বাঘ শিকারীর প্রাণ যায় বাঘের হাতে, সাপের ছোবলেই মরে ওঝা, বিমানচালনা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিমান-চালককে প্রাণ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েই বাঁচতে হয়। অ্যামি জনসন, মিসেস পুটনাম প্রভৃতি বিমানচালনার দুঃসাহসী বীর মেয়ে বিমানেই প্রাণ দিয়েছেন। বাঙালীদের মধ্যে বিমানচলনায় পথিকৃৎ যে বিনয় দাস তাঁকেও নিয়তি একই পরিণতিতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এমনিতে বিমানচালনা সখের মাথায় মন্দ লাগে না ; কিন্তু আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভর নিরাশ্রয় জীবনে ঝড়ঝঞ্ঝা মেঘ বাদল ছাড়াও বিপদের অন্ত নেই। চিলের ডানার ঝাপট, ঘুড়ির সুতোর জট, উঠতে নামতে গাছের ডালেই ঝুলে থাকা, জনমানববিহীন ভয়াল কোন অঞ্চলে। এ খেলাই সত্যিকার খেলা—প্রাণ নিয়ে খেলা। শক্ত মাটির উপর বসে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় যে, শূন্যের উপর অনেকগুলি মানুষের প্রাণের দায়িত্ব বহন করে অঙ্গুলি সঞ্চালনের সূক্ষ্মতম নিয়ন্ত্রণে তাদের যথাসময়ে বাঞ্ছিত স্থানে নামিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কি গুরুভার।

এ গুরুভার যারা দুনিয়ায় বইছে, ভারতেও তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তবু দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে একেবারে অনন্যা। সেদিক দিয়ে খেলাধূলার রাজ্যেই তাঁর বিচরণ, কিন্তু তাঁর মনে খেলা খেলা ভাব করে, হারি জিতি নাহি লাজ করার উপায় নেই। গন্তব্য পথে তাঁকে পৌঁছতেই হবে বহাল তবিয়তে, শুধু নিজের তবিয়ত সামলালেই চলবে না, "নিয়েছ যে মহাভার"।

বিমানচালনা অ্যাডভেঞ্চার, মস্ত বড় অ্যাডভেঞ্চার, শূন্যমার্গে স্পেস রকেটে পৃথিবী পরিক্রমার আগের পর্যায়। কিন্তু অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক রেমার্ক

যা বলেছিলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যার জীবনযাত্রা, মৃত্যু তার কাছে অ্যাডভেঞ্চার নয়। একবার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সেই খ্যাতির সুদে ও রোমন্থনে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব; কিন্তু দিনের পর দিন এরোপ্লেন নিয়ে রুটিনমত আকাশে ওড়া, তার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদটুকুও লোপ পেয়ে যায়। এই দৈনন্দিন কর্মে প্রচারের চোখধাঁধানো দীপ্তি নেই, নেই উপস্থিত জনতার করতালি ও কলকণ্ঠ অভিনন্দন। সবার চোখের আড়ালে, উৎসাহ ও বাহবার কোন প্রত্যাশা না রেখে, উদ্বেলিত উত্তেজিত কণ্ঠের উৎসাহদান ও অভিনন্দন—কোন কিছু না পেয়েও যাকে আকাশে ওড়ার মত দুঃসাহসিক কাজ করতে হয় প্রতিদিনের ছক-বাঁধা রুটিন অনুযায়ী, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের 'বীরচক্র' বিজয়ীর চেয়ে সে কম নয়।

দূর্বা ব্যানার্জী আজ প্রায় চার বছর ধরে বিমানচালনার কাজ করছেন। আজও কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিমান পরিবহণ সংস্থা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশন তাঁকে চালকের কাজ দিতে অস্বীকার করেছে। এ প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন মেয়েদের দুর্বল হাতে অমন গুরু কর্মভার দেওয়া যায় না। তাই গভর্নমেণ্ট পরিচালিত ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশনে চাকরী পাননি। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার পাইলট দূর্বা ব্যানার্জী।

যখন দূর্বা দেবীকে চাকরী না দেওয়া পার্লামেণ্টে জোর গলায় সমর্থন করেছিলেন সরকার, সে সময়কার বে-সামরিক বিমান চলাচলের মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবির, পরে যেদিন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় চালিত বিমানে আমবাড়িতে যান, সেদিন কবির সাহেব বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতা ও জামসেদপুরের মধ্যে যে নিয়মিত সার্ভিসটি বর্তমানে আই এ সি নিয়ে নিয়েছে তা শুরু করেছিল এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) এবং তার উদ্বোধনী ফ্লাইটে পাইলট ছিলেন দূর্বা ব্যানার্জী।

আজ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার ঘণ্টা বিমানচালনা করেছেন তিনি এবং তাতে সাত লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে।

এই সাত লক্ষ মাইল বিমানচালনার ক্ষুদ্র ইতিহাসে কোনদিন কোন অবস্থাতেই তাঁকে বাধ্য হয়ে অস্থানে অসময়ে অবতরণ করতে হয়নি। বিপদ এসেছে। কিন্তু সর্বংসহা বসুন্ধরার দ্বিতীয় সংস্করণ যে নারীজাতি তার ধৈর্যের সুনাম রক্ষা করে ধীর স্থির মস্তিষ্কে বরফের মত ঠণ্ডা মাথায় বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি বহুবার।

দার্জিলিং থেকে চা বোঝাই বিমান নিয়ে আসবার সময় একবার সামনে পড়লো প্রকাণ্ড মেঘ। এড়িয়ে ঘুরে যেতে হলে যে পরিমাণ পেট্রল লাগবে তা নেই। কাজেই জেনেশুনেই সাহসে বুক বেঁধে মেঘ চিরে বেরিয়ে যাবার সংকল্পে স্পীড দিলেন। প্রবল ঝড় কাটিয়ে ঠিক চলে এলেন। দমদমে নেমে দেখা গেল চায়ের বাক্সগুলো সব ওলটপালট, সারাটা বিমানগহ্বর জুড়ে পুঞ্জীভূত চা।

বালি-র মেয়ে, এই হাওড়া জেলায় ওঁর আদি বাড়ি। পিতামহ কার্যব্যপদেশে পাটনায় স্থায়ী হন। সেই পাটনায় ১৯৩০ সালে দূর্বার জন্ম। পিতা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলিটারী অ্যাকাউন্টস-এর ডেপুটি কণ্ট্রোলার হিসাবে মীরাটে ছিলেন অনেক দিন। সেখানেই দূর্বার স্কুলজীবন অতিবাহিত হয়। অ্যামেরিকান প্রভাবে সেই সৈন্যপ্রধান শহরে মেয়েদের স্কুলেও বেসবল ও বাস্কেটবলই ছিল প্রচলিত খেলা। প্রচুর উৎসাহ ও অনবদ্য নৈপুণ্যে ওই খেলাগুলি খেলেছিল মেয়েটি। বহু প্রতিযোগিতায় জয়ীও হয়েছিল ওই স্কুলের দল। তারপর পাটনায় ফিরে আসা। সেখানেই ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়া। কিন্তু পাটনায় মেয়েদের খেলাধূলার সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাবে অন্য দিকে মন ফেরাতে হয় দূর্বা দেবীকে। গানবাজনা নাচগান আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদি তরুণীসুলভ সব কিছুতেই তিনি কলেজ-জীবনে মহা উৎসাহে অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৯৫২ সালে বি এ পাস করেন। পিতা ছিলেন গণিতে বিশেষজ্ঞ। মেয়েরও ছাত্রীজীবনে গণিতে উৎসাহ ছিল প্রচুর। বিহার ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষানবিশ গ্রহণের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে নাম লেখালেন। এক ভাই বিহার ফ্লাইং ক্লাবে কাজ করতেন, তাঁর সহযোগিতায় শিক্ষানবিস হিসেবে ভরতি হলেন। বাড়ির কেউ, বাবা-মা কেউই বাধা দিলেন না।

কিন্তু বাধা এল বাইরে থেকে, প্রবল বাধা। বিহার ফ্লাইং ক্লাব জানালে মেডিকেল সার্টিফিকেট চাই। দু'টাকার ডাক্তারিতেই হ'ত। কিন্তু খবরটা ওঁর জানা ছিল না, তাই চলে গেলেন সোজা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তার ব্যাপারটা জানতে পেরে এমন বক্তৃতা শুরু করলেন মেয়েদের উড়নচণ্ডী প্রবৃত্তিকে নিন্দে করে যে, কলেজের একগাদা ছাত্রের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল সেই তরুণী বাঙালী মেয়েটির।

এত সত্ত্বেও ডাক্তার চোখ খারাপের অপবাদ দিয়ে দিলেন। দূর্বা দেবী ক্লাবের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হুকুম হল দিল্লি মিলিটারী হাসপাতালের সার্টিফিকেট দাও। সে আর এক পরীক্ষা। দূর্বারই মত নমনীয় একটি তরুণীকে মিলিটারী হাসপাতালে গিয়ে আর একবার বক্তৃতায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে হল। তবু সাফল্য শেষ পর্যন্ত।

অনেক কিছু শিখতে হয়েছে, আবহাওয়া তত্ত্ব, রেডিও টেলিগ্রাফি, নেভিগেশান, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, এয়ার-লেজিস্লেশান, ইনস্ট্রুমেণ্ট রেটিং—আরও কত কি। এখনো তিনি শিখছেন। বাইরে না দেখে শুধু ভিতরকার যন্ত্রপাতি নির্ভর করে দিক ও স্থান নির্ণয় করে চলা-নামার বিশেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন বর্তমানে।

চাকরির জন্য নয়, বড় ভালো লাগে এমনি উড়ে বেড়াতে।

সকালে হয়তো আমবাড়ি, বিকেলে হয়তো মোহনবাড়ি, তারপর হয়তো ইম্ফল। মাসে প্রায় পনের দিন ওড়া,—বাকী ছুটি। ঘরে থাকলে আড্ডা, কি অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়া। গানের দিকে ঝোঁক খুব, ক্ল্যাসিকালে। নিজের অনুশীলনে পূর্ণতা লাভ হয়নি, তাই শোনার আগ্রহ খুব বেশী।

সারা জীবনই পাইলটবৃত্তি করবেন এমন জেদ নেই কিছু, একটা অ্যাম্বিশন আছে আই এ সি-তে মেয়ে পাইলটদের জন্য রুদ্ধ দ্বার খুলে দেবার, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, প্রবল প্রতিজ্ঞা, অমন হাসির ফোয়ারায়ও ওই একটি প্রসঙ্গে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ে।

নামে দূর্বা। চেহারায় বাঙলা দেশের মূর্তিমতী শ্যামলিমা, একজনের প্রসঙ্গে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী যা বলেছিলেন, বাঙলা দেশের শ্যামলা মেয়ে দীর্ঘ তনু, কুঞ্চিত কেশদাম। এরোপ্লেন চালাবার সময়কার সেই স্ল্যাক ও ব্লাউজ কেমন যেন বেমানান ঠেকে ওই চেহারা ও চলাবলার সঙ্গে। তবু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাইলট বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন ইতিমধ্যেই। একক জীবন। থাকেন গড়িয়াহাট রোডে সারদা সঙ্ঘ মহিলা নিবাসে অতি সাদাসিদে পরিবেশে।

সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম—'গগনবিহার তো অনেক করলেন—এবার ঘর বাঁধুন।' ও কথা নাকি কখনো ভাবেননি। কিন্তু কথাটা যদি একদিন প্রবল সমারোহে এসে মনের প্রাচীরে ধাক্কা মারে, তখন কি করবেন ?

আমার এই শেষ প্রশ্নের জবাবে স্বভাব-হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়ে বললেন, 'প্রাচীর যদি ভাঙে, ভাসবো।'

পাণিহাটির স্পোর্টস-পটিয়সী



নমিতা ঘোষ

ব্যক্তি বড় না প্রতিষ্ঠান বড়? এর জবাবে হয়তো সবারই এক উত্তর—প্রতিষ্ঠান বড়।

আবার নানা ব্যক্তির সৎ এবং মহৎ কাজের উপরই যে প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং তার স্থায়িত্ব একথাও অস্বীকার করা যায় না।

সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের কথাই ধরা যাক। আচার্য কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি নেতা, বহুর সঙ্গে যাঁরা ত্যাগে সেবায়, সাধনায় কর্মক্ষমতায় কংগ্রেসকে পরম শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তবু কংগ্রেস—কংগ্রেস, দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক।

আবার এই সব দেশনায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও এখনো নেতা, সবার সম্মানের পাত্র। তাঁদের কর্মধারা এবং বক্তব্য দেশের সুনাগরিকের চিন্তার খোরাক। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছেদে দুইয়েরই ক্ষতি। উভয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক।

খেলাধূলার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সাধারণ খেলোয়াড় বড় ক্লাব—মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলে খেললে সে বড়

খেলোয়াড়। আবার বড় খেলোয়াড়ও বড় ক্লাব থেকে সরে এলে তার আদর কম। তাই বলে এ কথাও স্বীকার্য বড় বড় খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-কীর্তিতেই মোহনবাগান—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল—ইস্ট-বেঙ্গল। অবশ্যই পরিচালকদের ক্লাব পরিচালনার কৃতিত্বের কথা বাদ না দিয়ে।

আজ যে মেয়েটির জীবনী নিয়ে আলোচনা করছি সেই মেয়েটি এবং আর দু'একটি মেয়ের জন্যই অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের পরিচিতি। আবার পানিহাটি স্পোর্টিংই যে নমিতা ঘোষকে স্পোর্টস-পটিয়সী করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এখানেও সম্পর্ক পারস্পরিক। তবে আমার লেখার পাত্রী এবং পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্তরালে আছেন আর এক ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্যতম পরিচালক গৌরীপ্রসাদ রায়। এই তিনের সংযোগে অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে বাঙলা পেয়েছে এক কৃতী কন্যাকে।

পানিহাটির স্পোর্টস পটিয়সী নমিতা ঘোষের ঘরে আজ শ'দুই পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র থরে থরে সাজানো। সোনার মেডেলের সংখ্যাই ২৫টি। আর এসব পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র নমিতা পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের হাত থেকে। কলকাতা, কটক, দিল্লি, বোম্বাই, জব্বলপুর, জলন্ধর, ত্রিবেন্দ্রাম প্রভৃতি যে সব জায়গায় জাতীয় অ্যাথলেটিকসের আসর বসেছে সেখানকার মাঠেই রয়েছে নমিতার পায়ের চিহ্ন। সর্বাভারতীয় স্পোর্টসে বাঙলার দশবারের প্রতিনিধি। সর্বভারতীয় স্কুল স্পোর্টসেও সমপ্রতিনিধিত্ব। সাতবারের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন। দশ বছরের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের বড় অংশীদার।

আরও আছে। ১৯৫৮ সাল থেকে ৮০ মিটার হার্ডলস রেসে নমিতা বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই একটিমাত্র ইভেন্টে আজও বাঙালী মেয়ের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ।

লং জাম্পেও নমিতার কৃতিত্ব বাঙলী মেয়ের গর্বের বিষয়। ১৯৬১ সালে কালীঘাট স্পোর্টসে নমিতা লাফিয়েছে ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী মেয়েই এতখানি লাফাতে পারেনি। লং জাম্পে বাঙলার রেকর্ডের অধিকারিণী রেঞ্জার্স ক্লাবের গ্লোরিয়া প্রাউলিংয়ের লাফের দূরত্ব ১৫ ফুট ১১½ ইঞ্চি, নমিতার চেয়ে মাত্র ১½ ইঞ্চি বেশী।

এ ছাড়া পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ে হিসাবে কত স্কুল স্পোর্টসে নমিতা কৃতিত্বের সাক্ষর এঁকেছে তার হিসাব নিকাশ নেই।

স্পোর্টসের পরিবেশের মধ্যে নমিতার স্পোর্টসে হাতে খড়ি। পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের ছোটদের বিভাগের নাম ছিল 'পানিহাটি বয়েজ স্পোর্টিং'। নমিতাদের বাড়িতেই ছিল তার প্রধান কর্মকেন্দ্র। কাকা গৌরহরি দাস ঘোষ কর্ণধার। খেলা-পাগল মানুষ। খেলার মধ্য দিয়ে মানুষ গড়াই তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কিছুটা সফল না হয়েছে, এমন নয়। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম খেলা শিখে মোহন-বাগানের ফুটবল গোলকিপার সনৎ শেঠ, ইস্টার্ন রেলের রাইট আউট স্বরাজ ঘোষ ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাঁর ছাত্র আরও অনেকে খেলেছে কলকাতার প্রথম ডিভিশন ক্লাবে। নমিতার মা জ্যোতির্ময়ী ঘোষেরও খেলাধুলার উপর একটা বিশেষ টান। বাড়িতে ক্লাব। ছেলেরা এসে হৈ-হুল্লোড় করে, লাফালাফি দাপাদাপি করে। জ্যোতির্ময়ী দেবী শুধু সহ্য করেন তাই নয়, হাসিমুখে উৎসাহ দেন, পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে এনে রেঁধে খাওয়ান। সে অবশ্য আগের কথা। পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের শিশু বিভাগ এখন বড় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এবং সেবার স্বীকৃতি হিসাবে নমিতার কাকা এবং মা ক্লাবের আজীবন সদস্য।

নমিতাদের বাড়ির সামনেই ছিল খেলার মাঠ। দিদিদের সঙ্গে ওখানেই প্রথম ও দৌড়োদৌড়ি শুরু করে। ১৯৫০ সালে গৌরী-

প্রসাদ রায় যখন ক্লাবের সম্পাদক হয়ে আসেন দিদিরা তখন অন্দর-মহলে বন্দী।

সেবার কালীঘাট স্পোর্টসে একটিও বাঙলী মেয়ে ছিল না। কি একটা কারণে বাঙলার তখনকার শ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট নীলিমা ঘোষ যোগ দেননি। গৌরীপ্রসাদ রায়ের এ দৃশ্য বড় চোখে লাগে। বাঙলার মাঠে স্পোর্টস অথচ একটিও বাঙালী মেয়ে নেই! তিনি ঠিক করলেন পানিহাটি স্পোর্টিং থেকেই মেয়ে বের করবেন। জোর কদমে শিক্ষা আরম্ভ হল।

কলকাতায় দৌড়নোর কথা শুনেই নমিতার চক্ষু চড়কগাছ। তাও আবার মেমসাহেবদের সঙ্গে। তবু মা, দিদি ও কাকার উৎসাহ পেয়ে আর শিক্ষাগুরু গৌরীপ্রসাদের আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৫২ সালে কালীঘাট স্পোর্টসে প্রথম নামল নমিতা খালি-পায়ে ফ্রক পরে। সঙ্গে ক্লাবের আরও একটি মেয়ে। নাম কমলা শ্রীমানী। এই ঘটনায় 'উইমেনস স্পোর্টস ওয়াল্ড' কাগজে লেখা হল:

"...The Kalighat meet also saw the debut of two other moffusil girls, Nomita Ghosh and Kamala Sreemany from Panihati. Both of them failed to achieve anything in their Broad Jump event; yet with their zeal and enthusiasm they are sure to come up just with a bit of training and practice as also with better equipments."

এই আগ্রহ এবং উৎসাহের ফলেই নমিতা আজ স্পোর্টসে সুপ্রতিষ্ঠিত। আগ্রহ এবং উৎসাহের চেয়েও বেশী ছিল নমিতার আন্তরিকতা। না হলে পানিহাটি স্পোর্টসে জীবনের প্রথম ব্যর্থতায় কেউ কেঁদে আকুল হয়!

আন্তরিকতা আবার একতরফা নয়। একদিকে ছাত্রীর অপরদিকে শিক্ষকের। নমিতা চেয়েছে স্পোর্টসে পটু হতে, সবার

আগে এগিয়ে যেতে। গৌরীপ্রসাদ চেয়েছেন তাকে এগিয়ে দিতে। অবশ্য শুধু নমিতাই নয়, এক সঙ্গে পাঁচটি স্পোর্টস-পটু মেয়ে বেরিয়েছিল পানিহাটি স্পোর্টিং থেকে।

স্পোর্টসের উন্নত শিক্ষার জন্য যখন যার কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য পেয়েছে সেটুকুই আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে নমিতা। বিশ্বখ্যাত দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক এসেছেন তাঁর সহধর্মিণী অলিম্পিকের জ্যাভেলিন-চ্যাম্পিয়ন ডানা জ্যাটোপেকভার সঙ্গে। নমিতা যেটুকু পারে তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। পোলভল্ট চ্যাম্পিয়ন বব রিচার্ডের ক্লিনিকে নমিতা সদা হাজির, ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন বব ম্যাথিয়াসের সঙ্গে ছায়ার মত নমিতার কায়া। মাদ্রাজের ওয়াই এম সি এ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের 'কোচ' টি ডবলিউ আর্নল্ডের কোচিং ক্যাম্পে নমিতা যেন কচি মেয়ে। ক, খ থেকে সবই শেখার বাসনা।

আর্নল্ড যাবার সময় নমিতার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে গেলেন। তাতে লেখা আছে ঃ

"She (Nomita) shewed keen interest, was present for every session and shows promise of becoming a great athlete. I have not found an athlete who is willing to train more faithfully in all of India."

শিক্ষাগুরু গৌরীপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে নমিতার নিজের কথা ঃ "জীবনে আজ যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার শিক্ষাগুরু গৌরদার। আদর্শ অ্যাথলেট তৈরী করতে শিক্ষকের যেসব চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংযম ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন তার এক অদ্ভুত সমন্বয় গৌরদা। সিনেমা না দেখা বা কম দেখা, ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করা, খেলার মাঠে কম কথা বলা, সৎসঙ্গ,

ধর্মে ভক্তি এসব সুশিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই আমি পেয়েছি। এবং একে আমি জীবনের পাথেয় বলেই মনে করি।"

নমিতার বড় ভাই রমাপ্রসাদ ঘোষ ফুটবলে ২৪ পরগণা জেলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ছোড়দা শিবপ্রসাদ ক্রিকেট-রসিক। বাবা জয়গোপাল ঘোষের নেশা তাসে ও ছিপ ফেলে মাছ শিকারে। রোজ সন্ধ্যার পর এক মাইল দূরে যান তাস খেলতে। কিন্তু যেদিন নমিতার স্পোর্টস থাকে সেদিন তার খবর না জেনে এক পাও এগোন না।

আগেই বলেছি ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। নমিতার কাছেও তাই। কলকাতার কয়েকটি ক্লাব নিজেদের দলে টানবার জন্য প্রলোভনের টোপ ফেলেছে বহুবার। কিন্তু নমিতা পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি।

গঙ্গার কূলে বাড়ি। সুতরাং সাঁতারে সাবলীলা। ওটা সহজাত বিদ্যা। এক সময় অক্লেশে গঙ্গা পার হয়েছে। তবে সাঁতারে প্রতিযোগিতা করেনি। খেলাধূলার অবসরে ঘরের কাজকর্ম আর ফুল গাছের পরিচর্যা করে নমিতার সময় কাটে।

টেব্‌ল টেনিসের ইভ্‌


অর্পিতা দাস (ঘোষ)

উনিশ কুড়ি বছর পেছনে ফিরতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সবাই যদি স্বল্পবাক হয়, তবে তাঁদের জীবনী লিখি কি করে?

এককালের টেব্‌ল-টেনিস পটিয়সী অর্পিতা দাস, বর্তমানে খ্যাতিমান টেব্‌ল টেনিস খেলোয়াড় কুমার ঘোষের সহধর্মিণী অর্পিতা ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি নিজের ঢাকে কাঠি দিতে শ্রী অর্পিতারও আপত্তি। মুখ খুলে যদি কেউ কিছু না বলে তবে আমাদের কলম খোলে কিভাবে?

জীবনী লেখার উপকরণ দু'টি। প্রথম উপকরণ কিছু কিছু রেকর্ড বই, যাতে হারজিতের যোগ-বিয়োগের হদিস মেলে, কিন্তু মেলে না খেলোয়াড় জীবনের সামগ্রিক যোগফল। ওতে অনেক কিছুই লেখা থাকে, থাকে না খেলার রূপ, রস ও রঙের ছবি।

দ্বিতীয় উপকরণ স্মৃতি ও শ্রুতি। কিন্তু স্মৃতি ক্রমেই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। শ্রুতির হয় বিলুপ্তি। ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসে।

অর্পিতা দাস সে যুগের মেয়ে, যে যুগে মেয়েরা খেলাধুলায় বেশী নামেনি। আর একটু বড়সড় ও ডাগরডোগর বাঙালী মেয়ের মাঠে নামা অনেকের কাছেই অপরাধ বা বেয়াদপি বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু অর্পিতা দাসরা অন্য আবহাওয়া ও অন্য পরিবেশে মানুষ। যে পরিবেশ মধ্যবিত্ত সমাজের ভ্রুকুটির ধার ধারে না। তাই খেলা-ধূলায় সে যুগের বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অর্পিতা অনন্যা।

আমি বলছি তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দিকের কথা। তখন ব্যাডমিণ্টনে তিনবার অর্পিতার কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ, বাঙলার টেব্‌ল টেনিসে তিনবার বিজয়িনীর সম্মান। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পার্শী, পাঞ্জাবী ও খাসিয়া মেয়েদের মধ্যে অদ্বিতীয়া, ভারত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়া। দু'বার রানার্সের সম্মান। এক অর্পিতা দাস ছাড়া জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে আর কোন বাঙালী মেয়ে আজও এ সম্মানের অধিকারিণী হয়নি।

অর্পিতা দাসের বাবা রজনীকান্ত দাস শিব ও সত্যের পূজারী। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পরম শান্তিবাদী পুরুষ। কোন কিছুর মধ্যেই তিনি দোষ দেখেন না। নিজে কোনদিন খেলাধূলা করেননি। তাই বলে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করবে না? কোন-দিন ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় তিনি বাধা তো দেনইনি বরং উৎসাহ দিয়েছেন সব সময়। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় আগ্রহের আর একটি কারণ। পিতৃকুল ও রসে বঞ্চিত হলেও মাতৃকুল সম্পদশালী। চার মামাই পাকাপোক্ত ফুটবল খেলোয়াড়। এর মধ্যে ছোট মামা প্রশান্ত বর্ধনের দেশ জোড়া নামডাক। লেফট আউট হিসাবে যাঁকে শিবদাশ ভাদুড়ী, সামাদ ও নাইটের পরের পর্যায় ফেলা যায়। খেলার নেশা বর্ধন পরিবার থেকে সংক্রামিত হয় দাস পরিবারে। দু'ভাই ও পাঁচ বোন সবাই খেলাধূলায় মেতে ওঠে।

অর্পিতা দাসদের আদিবাড়ি ময়মনসিং জেলার ভবখালী গ্রামে। কিন্তু গ্রামের বাড়ির সঙ্গে কোনদিন যোগাযোগ ঘটেনি। বাবা ছিলেন শিলং-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্টস অফিসার। জন্ম থেকে আট বছর পর্যন্ত কেটেছে শিলং-এ। তারপর কলকাতায়।

কল্যাণ আর অর্পিতা পিঠেপিঠি ভাইবোন। দেড় বছরের

পার্থক্য। দু'জনই ডানপিঠে, খেলাধূলায় দু'জনই বড় হতে চায়। কল্যাণ খেলে ক্লাবে। কিন্তু অর্পিতার সুযোগ কম। নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে ভাইবোন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে শুধু খেলাধূলার ঘরোয়া অনুশীলন। দৌড় ঝাঁপ, সাইকেল, এমন কি ক্রিকেটও।

সাইকেল চালনায় অর্পিতার আগ্রহের একটু কারণও ছিল। বাঙ্গলার বিখ্যাত সাইকেল চালক বিমল মুখার্জি, যিনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে সাইকেলে বিশ্ব পরিক্রমা করে ফিরে এসেছেন তিনি অর্পিতার এক ভগ্নিপতি। অর্পিতা দাসের ছোট বোনের স্বামী মোহনবাগানের এ দেবও (কানি দেব) চৌকস খেলোয়াড়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটি খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু অর্পিতার সঙ্গে এ দেবের সম্পর্ক অনেক পরে। ছোট বোনের সঙ্গে 'কানির' বিয়ের অনেক আগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্পিতার খ্যাতি।

অর্পিতা দাস যখন লরেটোর ছাত্রী তখনও খেলাধূলায় তাঁর নাম নেই। আশুতোষ কলেজে ভর্তি হবার পর প্রথম বছরের স্পোর্টসে তাঁর কৃতিত্বের প্রথম পরিচয়। কয়েকটি দৌড়ে সাফল্যের পর যে পয়েন্ট হ'ল তাতে 'ইণ্ডিভিজুয়াল' চ্যাম্পিয়নশিপ প্রায় হাতের মুঠোয়, বাকী মাত্র দুই তিনটি পয়েন্ট। এমন সময় বর্শা নিক্ষেপে অর্পিতা হলেন ফার্স্ট। চ্যাম্পিয়নশিপ আর যায় কোথায়?

কিন্তু ইণ্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন না অর্পিতা দাস। কারণ বিচারকদের সিদ্ধান্তে তাঁর জ্যাভেলিন থ্রো 'নো থ্রো' হয়ে গেল। সার্কেল থেকে পা গেল একটু বেরিয়ে। তা যাক। যা পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট।

ছোড়দা কল্যাণ দাস তখন মোহনবাগান ক্লাবের দ্বিতীয় টিমের হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড়। বাড়িতে সব সময় খেলার আলোচনা। অর্পিতা দাসও আস্তে আস্তে নাম কিনছেন। লাহাদের লাল বাড়িতে কি একটা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অর্পিতা যোগ দিলেন প্রথম

বাঙালী মেয়ে হিসাবে। ব্যাডমিণ্টনে পর পর তিন বছর পেলেন কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ। টান এলো টেব্‌ল টেনিসেও। কিন্তু উপকরণের অভাব। ব্যাট-বল জোগাড় করা কষ্ট নয়, কিন্তু কোথায় টেবিল? কোথায় বড় হল ঘর?

ইচ্ছে থাকলে কোন বাধাই যে বাধা নয় তার প্রমাণ দিলেন অর্পিতা। বাড়িতে ডাইনিং টেবিলে খেলা আরম্ভ করে। নেট নেই। তাতে ক্ষতি কি? পড়ার বইই সই। আড়াআড়িভাবে টেবিলের মাঝখানে বই সাজিয়ে নেটের প্রয়োজন মেটানো হল। ভাই-বোনদের সঙ্গে চলল খেলা। কি একটা ছুটি উপভোগ করতে ওরা সপরিবারে কুমিল্লা গেলেন। সেখানে টেব্‌ল টেনিসের এক প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা হল। ডাইনিং টেবিলের বদলে উঁচু তক্তপোষ জোগাড় হল, নেটের বদলে বই ঠিকই রইল। অর্পিতা দাস ছেলে-মেয়ে সকলকে হারিয়ে হলেন বিজয়িনী। সবাই বলল—'তোর তো চমৎকার মারের হাত, টেব্‌ল টেনিসে নাম দিস না কেন?'

ওখান থেকে প্রতিযোগিতা খেলার অনুপ্রেরণা। কলকাতায় এসে বড় প্রতিযোগিতায় আনাগোনা। ১৯৪০ সালে যেবার আশুতোষ কলেজ থেকে অর্পিতা বি এ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেবারই ফাইন্যালে আর এক বাঙালী মেয়ে রমলা নাগকে হারিয়ে পেলেন টেব্‌ল টেনিসের বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। কলেজের খেলা-ধূলায় ছেদ পড়ল, কিন্তু সামনে খোলা রইল বিশাল ভারতের বিস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্র। ওই বছরই মাদ্রাজে জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে প্রতি-নিধিত্ব করবার জন্য বাঙলা দলে তাঁর ডাক পড়ল। ফাইন্যালে উঠে বোম্বের পার্শী মেয়ে পেরিন ম্যাডানের কাছে হারলেন পাঁচ সেটের খেলায়। খুবই ভাল খেলেছিলেন অর্পিতা দাস। পঞ্চম সেটে তিনি প্রায় জেতার মুখে। শুধু টেবিলে বল রাখলে পরের ভুলে তিনি জিতে জান, কিন্তু মারতে গিয়ে তাঁকে হারতে হল। দর্শক চোখের কষ্টদায়ক মন্থর খেলা তাঁর স্বাভাববিরুদ্ধ। এরপর দু'বার

বোম্বেতে, একবার করে মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় অর্পিতা দাস জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

১৯৪৫-৪৬ সাল অর্পিতা দাসের গর্বের বছর। প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনে এ বছর তিনি ছিলেন গৌরবের উচ্চ শিখরে। ফাইন্যালে পাঞ্জাবের পোক্ত খেলোয়াড় কুমারী হীরা ঠাকুরকে হারিয়ে মেয়েদের মধ্যে তিনি পেলেন বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়নশিপ, পুরুষদের বিভাগে তাঁর ভাবী স্বামী কুমার ঘোষ। দু'জনের দ্বৈত খেলায় অর্থাৎ মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান। দু'জনের মাথায় তিনটি মুকুট। অর্পিতা দাস শেষবার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন ১৯৪৭-৪৮ সালে ফাইন্যালে গ্লোরিয়া গ্রীনকে হারিয়ে।

কুমার ঘোষ ও অর্পিতা দাস বাঙ্গলার টেব্‌ল টেনিসের 'আদম' ও 'ইভ'। যখনকার কথা বলছি কুমার তখন টেব্‌ল টেনিসের নবকুমার, আর অর্পিতা রূপ কুমারী। দু'জনের যেমন রূপ তেমন গুণ। হকির ধ্যানচাঁদ আর টেব্‌ল টেনিসের বার্ণার বিশ্বে জুড়ি নেই। কিন্তু কুমারের ব্যাক হ্যাণ্ডে দেখেছি বার্ণার প্রতিভা। সে এক অপূর্ব মার, যা সাধনা করেও আয়ত্ব করা যায় না। 'আপনাতে আপনি বিকশি' সে মারের অপরূপ রূপ সৃষ্টি। সবটুকুর মধ্যেই ক্লাসিক টাচ।

ক্লাসিকের পূজারী ছিলেন অর্পিতাও। ওপার থেকে বল আসবে, এপার থেকে কোনভাবে সে বল ফিরিয়ে দেব—অর্পিতা এমন খেলাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কোমল হাতে শক্ত মার ছিল। 'ব্যাক হ্যাণ্ড ফ্লিক' এবং দুদিকের 'চপ ডিফেন্সিভ' মারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। টেব্‌ল টেনিসের বিজ্ঞানসম্মত নানা স্ট্রোকের মধ্যে দুটিই কঠিন স্ট্রোক। পুরুষ খেলোয়াড়ের পক্ষেও আয়ত্ব করা শক্ত। কিন্তু মেয়ে হয়েও এ মার আয়ত্বের জন্য অর্পিতাকে বেশী মেহনত করতে হয়নি। এটা ছিল তাঁর খেলার স্বভাবধর্ম।

ক্লাসিক খেলার কদর জানতেন কুমার ঘোষ এবং দু'জনের চোখে

ছিল দু'জনের খেলার মোহ। দু'জনই দু'জনের ভক্ত, খেলার সমজদার। অন্তরঙ্গতার ফলে প্রথমে খেলার পার্টনার, পরে পার্টনার জীবনের।

অর্পিতা দাসের শখ ছিল পাইলট হবেন। ছোড়দা কল্যাণ দাস এয়ার ফোর্সে চাকরী নেবার সময় কানে কানে সে কথা বলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এলহাবাদে এয়ারক্র্যাসে ফ্লাইট লেফ্‌ট্যান্যান্ট কল্যাণ দাস ইহলোক ত্যাগ করায় অর্পিতার আশা পূর্ণ হয়নি। বি এ পাশ করার পর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন থেকে তিনি ডিপ্লোমা নিয়ে কিছুদিনের জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস হন। এখন হিন্দী হাইস্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস। মাঝে কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছেন। শাড়ি পরে দু'একটি ম্যাচও খেলেছেন ওখানে।

সে এক মজার ঘটনা। বার্মিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপে কুমার ঘোষ খেলতে ইচ্ছুক। কিন্তু বার্মিংহামের সেক্রেটারী বিলেতের খ্যাতনাম্নী টেনিস ও টেব্‌ল টেনিস খেলোয়াড় অ্যান হেডেনের বাবা এড্রিয়ান হেডেন ভারতীয় সম্পর্কে উন্নাসিক। তিনি কালো আদমীকে পাত্তা দিতে চান না, যদিও কুমার বা অর্পিতার গায়ের রং কালো নয়। শেষ পর্যন্ত বাধার বাঁধ ভেঙ্গে কুমার যখন ওখানকার চ্যাম্পিয়ন হলেন তখন আদরের বহর দেখে কে ? খেলা দেখে সবাই পাগল। যখন শুনলো অর্পিতাও খেলতে জানেন তখন আব্দার হল 'আমরা শাড়ি পরা অবস্থায় খেলা দেখতে চাই।' খেলা তখন অর্পিতার পড়ে গেছে, তবু অনুরোধ রেখেছিলেন অর্পিতা। শাড়ি পরে খেলে বাহবাও পেয়েছিলেন বিলেতের টেব্‌ল টেনিস সমজদারদের।

কুমার ও অর্পিতা ঘোষের বুক জুড়ে আছে একমাত্র মেয়ে অনুরাধা। বয়স ১০ বছর। লরেটোর ছাত্রী। কেবল সাঁতার শিখছে। অন্য কোন খেলাধূলা এখনো আরম্ভ করেনি।

জলে অনুরাগিনী অনুরাধা


অনুরাধা গুহঠাকুরতা

দু'বছরের ছোট-বড় ভাই-বোন প্রবুদ্ধ আর অনুরাধা। গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল থেকে প্রবুদ্ধ স্পোর্টসের প্রাইজ নিয়ে আসে, অনুরাধা শুকনো মুখে ঘরে ফেরে। মনে ওর বড় কষ্ট। দু'বছরের ছোট হয়েও প্রবুদ্ধ কেমন চটপট এগিয়ে যাচ্ছে খেলাধূলায়, আর ও কিছু করতে পারছে না। অথচ খেলাধূলা করার জন্য সবসময়ই ওর মন কাঁদে। মার কাছে মামা-মাসি বাবা কাকার খেলধূলার গল্প শুনে মন আরও খারাপ হয়ে যায়। কলেজের মাঠে দৌড় ঝাঁপে মাসিরা নাম কিনেছিলেন। ঘরে স্পোর্টসের প্রাইজ আছে থরে থরে সাজানো। কাকাদের কত গল্প। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় ছোট কাকা প্রবীর গুহঠাকুরতার দৌড়ের রেকর্ড কলেজ স্পোর্টসের রেকর্ডের খাতায় বহুদিন ধরে বড় অক্ষরে লেখা ছিল। ছোট মামা দ্যুতীশ সরকার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির রোয়িং ক্যাপ্টেন। রোয়িংয়ের ডোরাকাটা জামা পরে যখন রোয়িং করে কি সুন্দর দেখায়। ইউনিভার্সিটির 'ব্লু' পরে কি চমৎকার ছবি তুলেছে। স্পোর্টসের পোশাক পরা মামাদের ছবির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অনুরাধা।

বাবার কলেজ-জীবনের ছবির পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করে। বাবা প্রতিভূ গুহঠাকুরতা স্পোর্টসে অবশ্য খুব সুপ্রতিষ্ঠিত নন। তবু যৌবনে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। হকি খেলেছেন টাউন ক্লাবে, টেনিস যাদবপুর কলেজের ছাত্র-জীবনে। মাতৃকুল ও পিতৃকুলের স্পোর্টস-প্রীতির কিছুটা পরিচয় রয়েছে প্রতিভূ গুহঠাকুরতার পুত্র প্রবুদ্ধের মধ্যে। কিন্তু মেয়ে অনুরাধা ব্যতিক্রম।

কেন ব্যতিক্রম? না, বড় রোগা মেয়ে। অসুখ বিসুখ কিছু নেই। কিন্তু অপটু দেহ আর অপূর্ণ অবয়ব খেলাধূলা করার পথে প্রধান অন্তরায়। এজন্য মার মনেও দুঃখ কম নয়। দু'টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটি মুখভার করে বসে থাকে, ভাইয়ের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে না। এতে মার মনেও শান্তি নেই।

ওদের জন্য, হ্যাঁ ওদের জন্যই মা কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার ঢাকুরিয়া লেকের এণ্ডারসন ক্লাবে ভর্তি হওয়া। যে ক্লাবের আর এক নাম ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি। অবশ্য সাঁতার শেখার শখ কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার নিজেরও ছিল। কিন্তু প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ক্লাবের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে খোলা মাঠের খেলাধূলায় ছেলে-মেয়ের শরীর সুপটু করে তোলা। খেলাধূলায় ভাই-বোনেরও অসম্ভব অনুরাগ। কিন্তু অনুরাধার জলে বড় ভয়। ঐ অগাধ কালো জলে তার অজানা আশঙ্কা।

মা সাঁতার কাটেন। প্রবুদ্ধ ডাইভ করে, অনুরাধা ক্লাব চত্বরে ছুটোছুটি করে দিন কাটায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। লেকের খোলা হাওয়ায় অনুরাধার দেহে আসে লাবণ্যের আভা। ছুটোছুটিতে শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। দেহকে আর অপটু বলে মনে হয় না। তার মধ্যে যেন তেজের ছাপ, শক্তির দীপ্তি।

"...নদী-মাতৃক বাংলার মেয়ে তুমি। জলকে ভয় কেন?" বলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সাঁতারের 'কোচ' নলিনি

মালিক। স্বদেশে খ্যাত অলিম্পিক প্রত্যাগত ভারতীয় সাঁতারু অনুরাধাকে আশ্বাস দেন—'আমি তোমাকে সাঁতারে সু-পটু করে তুলব, ওই ওদের মত কেমন সুন্দরভাবে জলের বুকে ভেসে বেড়াবে, কম্পিটিশনে নেমে প্রাইজ পাবে, পাবে কত সম্মান।'

শিশুমনের রঙীন কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিলন ঘটে। মন থেকে শঙ্কা চলে যায়। স্বপ্নে রাঙ্গা অধ্যায়ের আশায় লেকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুরাধা। যে জলে ছিল তার সবচেয়ে বেশি ভয় সেই জলকেই সে আস্তে আস্তে ভালবাসতে আরম্ভ করে। অনুরাধা যেন নতুন জীবনের সন্ধান পায়। এটা ১৯৫৪ সালেব কথা। অনুরাধার বয়স তখন দশ কি এগারো।

অল্পদিনের কোচিংয়েই ফল দেখা গেল। ফ্রি স্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক এবং ব্রেস্ট স্ট্রোক তিনটি বিষয়েই বেশ সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল অনুরাধা। তবে ব্যাক স্ট্রোকেই যেন স্বাচ্ছন্দ্য বেশি। নলিন মালিক বললেন—'তোমার মধ্যে জন্মগত প্রতিভা রয়েছে, বেশি কষ্ট করতে হবে না আমাকে।' ঐ বছরেই হেদোয় 'জুভেনাইল' ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যাক ও ব্রেস্ট স্ট্রোকে অনুরাধার নাম দিয়ে দিলেন নলিন মালিক। ব্যাকে অনুরাধা হল থার্ড, ব্রেস্টে কিভাবে ফাস্ট হয়েছিল অনুরাধা আজও জানে না। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় এই অভাবনীয় সাফল্য অনুরাধার মনে এনে দিল আরও এগিয়ে যাবার সংকল্প। ন্যাশানাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় আরতি সাহা, আরতি শেঠ ও কল্যাণী বসু প্রভৃতি নাম করা সাঁতার পটিয়সীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একশ মিটার বুক সাঁতারে ও হল দ্বিতীয়, আরতি সাহা প্রথম।

তারপর ছোট বড় অনেক প্রতিযোগিতা থেকে অনেক পুরস্কার ওর হাতে এল। বেশির ভাগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের এবং সবই ব্রেস্ট স্ট্রোকের। কিন্তু ওতে ওর মন ভরে না। ও চায় সাঁতারে যারা প্রধান তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম স্থানের অধিকারিণী হতে।

ব্রেস্ট স্ট্রোকে বেশ একটু নাম হল অনুরাধার। 'ব্রেস্ট' টানার ভঙ্গিও চমৎকার। শুধু মাথাটা থাকবে জলের উপরে, হাত-পা সবই জলের নীচে। হাত দিয়ে জল টেনে আর পা দিয়ে জল ঠেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সমান গতিতে জলের উপর সারসের সাঁতার কাটার মত! কিম্বা বলা যায় ডানা মেলা পাখীর স্বচ্ছ গতির মত পাখীর ডানার ছুটফটানি চোখে পড়ে না অথচ শূন্যের বুকে পাখী কেমন সুন্দর গতিশীল। ব্রেস্ট স্ট্রোকের সাঁতারুর হাত পায়ের কাজও চোখে দেখা যায় না। জলের নীচে হাত পায়ের কার্যকারণে দেহ এগিয়ে চলে স্বচ্ছ গতিতে। সাঁতারের যতরকমের প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে ব্রেস্ট স্ট্রোক দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক দৃশ্য। জলের বুকে কল্লোলহীন নৈঃশব্দের সুষমামণ্ডিত সাঁতার। রমণীর ক্ষেত্রে আরও রমণীয়। আলো ঝলমল পুকুরে সাঁতার কাটার সময় যেন সচল জল-পরী।

১৯৫৫-৫৬ সালে দু'বছর ধরে অনুরাধাকে অল্পের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে হল। অর্থাৎ পুরোবর্তিনীদের পশ্চাদ্ধাবন করেও পেছনে ফেলতে পারল না। তবু মেয়েদের সাঁতারে অনুরাধা অন্যতম আকর্ষণ। এর মধ্যে 'আজাদ হিন্দ বাগে' অল ইণ্ডিয়া সিলেকশন ট্রায়ালে একবার আরতি, সন্ধ্যা, কল্যাণী, ডলি নাজির প্রভৃতি সাঁতারের স্বনামধন্যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও খুবই আনন্দ পেল যদিও একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে চতুর্থ স্থান। ১৯৫৭ সালের সমস্ত মরসুমটাই ইনফ্লুয়েঞ্জায় কেটে গেল। সাঁতার কাটা হল না। বেশ মুষড়ে পড়ল অনুরাধা।

মুষড়ে পড়ার অবশ্য আরো কারণ ছিল। সাঁতারক্ষেত্রের শিকড় আটা অন্তর্দ্বন্দ্বে ওর সাঁতার-জীবনের উপর সমাপ্তির কালোছায়া পড়বার উপক্রম হল। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনিল দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে অভয় দিলেন। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কোচ এস পি গোস্বামীর হাতে এবার শিক্ষার

ভার পড়ল। সাঁতারের বিজ্ঞ শিক্ষক শান্তি পাল ওকে উৎসাহ দিয়ে ভুলত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন, বলহরি পালের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হল জোর অনুশীলন। নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণায় অনুরাধা সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল।

১৯৫৮ সালই অনুরাধার সাঁতার-জীবনের গর্বের বছর। দিল্লির জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধি নির্বাচনের ট্রায়ালে অনুরাধা একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে শুধু প্রথম স্থানই দখল করল না, রাজ্য রেকর্ডও প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, আর একটু অনুশীলন করলেই এর রেকর্ড আটকায় কে? সাঁতারে প্রভূত উন্নতির পরিচয় পেয়ে জাতীয় সাঁতারে ওকে বাঙলার মেয়ে টিমের অধিনায়িকা করা হল। দিল্লিতে জাতীয় সাঁতারের একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে মাত্র ·৩ সেকেণ্ডের জন্য অনুরাধা ডলী নাজিরের জাতীয় রেকর্ড ভাঙ্গতে পারল না। ডলীর রেকর্ড ছিল ১ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ড; অনুরাধা করল ১ মিনিট ৩৮·৩ সেকেণ্ড।

কিন্তু দিল্লী থেকে ফিরে এসে পর পর দু'টি স্পোর্টসে জাতীয় ও রাজ্য রেকর্ডকে ম্লান করে অনুরাধা অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী হল। প্রথমে ম্লান হল ডলী নাজিরের জাতীয় রেকর্ড। স্টেট-চ্যাম্পিয়নশিপে অনুরাধা করল ১ মিনিট ৩৭·৮ সেকেণ্ড; পরে ন্যাশনালের স্পোর্টসে ম্লান হল আরতি সাহার রাজ্য রেকর্ড। এবার একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে অনুরাধার সময় ১ মিনিট ৩৬·৩ সেকেণ্ড, ভারতে কোন মেয়ে আজ পর্যন্ত যা করতে পারেনি। অনুরাধার এই রেকর্ড রাজ্য রেকর্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে জাতীয় রেকর্ডের স্বীকৃতি পায়নি। কারণ জাতীয় অনুষ্ঠানে করা না হলে সে কৃতিত্ব স্বীকারের নিয়ম নেই।

১৯৬১ সালের জাতীয় সাঁতারে দিল্লিতে বসবাসকারিণী সুইডিশ তরুণী বি লারসেন ১ মিনিট ৩৭·৮ সেকেণ্ড সময়ে একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে নতুন জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছেন। কিন্তু

অনুরাধা গুহঠাকুরতার রাজ্য রেকর্ড আজও অম্লান, আজও লারসেনের সময়ের চেয়ে উন্নত।

১৯৫৯ সালে ব্রঙ্কাইটিস রোগের আক্রমণে অনুরাধার সময় ভাল হয়নি। ১৯৬০ সাল কেটে গেছে সিনিয়র কেম্ব্রিজের প্রস্তুতির জন্য। মিডলটন রো'র লরেটো হাউস থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করে অনুরাধা ভরতি হয়েছে বেথুন কলেজের ডিগ্রী কোর্সে। ডিগ্রী কোর্সে ওর ইংরাজীতে অনার্স। পড়া-শুনোর সাথে আবার পুরোদমে আরম্ভ করেছে সাঁতার। সঙ্গে আছে শিল্পচর্চা। শুধু চিত্রাঙ্কন ও বাটিকের কাজেই ওর হাত ভাল নয়, পাও ভাল ভারত নাট্যমের নৃত্যকলায়। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী বালকৃষ্ণ মেননের অনুরাধা প্রিয় ছাত্রী। খেলাধূলার মতই সমগ্র পরিবারের শিল্পপ্রীতি। ভাই প্রবুদ্ধর কিন্তু খেলাই ধ্যান-জ্ঞান। লা মার্টিনারের ছাত্র। টেব্‌ল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, হকি, ক্রিকেট সব কিছুতেই সমান আগ্রহ। এক ছোট্ট পরিবারের খেলাপটু ভাইবোন প্রবুদ্ধ আর অনুরাধা।

খেলায় ধন্যা রাজার কন্যা



রবিনা রায়

দীঘাপাতিয়ার রাজ-পরিবারের মেয়ে। রাজত্ব অবশ্য এখন পাকিস্তানের কুক্ষিগত। তবু মরাহাতি লাখ টাকা। মর্যাদা ও আভিজাত্যের রেশ সহজে মরে না।

দীঘাপাতিয়ায় অবশ্য কোনদিন যাবার সুযোগ ঘটেনি রবিনা রায়ের জীবনে। দার্জিলিং ও কলকাতার জলহাওয়ায় মানুষ। খেলাধূলা শিক্ষা-দীক্ষাও এই দুই যায়গায়।

অনেকেই ভেবেছিল সোনার হাতে সোনার কাঁকন পরে স্বপ্নরঙীন দিন কাটাবেন রবিনা রায়। কিন্তু সোনার কাঁকনের বদলে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন টেব্‌ল টেনিসের ব্যাট, হকি স্টিক, ফেন্সিং ফয়েল, রাশি রাশি বই ও শিল্পীর তুলি। খেলাধূলা, পড়াশুনা ও শিল্পের সাধনায় সঙ্গীত-মুখর জীবন রবিনা রায়ের। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে —তেমন বাঙালী মেয়ের আর এক উদারণ রাজ-পরিবারের রবিনা।

খেলাধূলায় উন্নতির উচ্চশিখরে অবশ্য এখনো উঠতে পারেন নি। তাঁর জীবনের বড় ঘটনার মধ্যে জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন একবার, আর এক অপ্রধান প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছেন বাঙলার দুই নম্বর মেয়ে শকুন্তলা দত্তকে। তবু এর মধ্যে বাঙলার টেব্‌ল টেনিসে রবিনা রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আলো ঝলমল টেব্‌ল টেনিস অঙ্গনে তাঁর খেলায় আলোর ঝলমলানি।

অন্য খেলাধূলায় অবশ্য অনন্যা নয় তবে সাধারণের মধ্যেও একটু অসাধারণ। কেননা—ক'টি বাঙালী মেয়ের হাতে হকি স্টিক উঠেছে? পায়ে রোলার স্কেট পরে কজন স্কেটিং করেছেন? ক'জন বাঙালী মেয়ে ফেন্সিং ফয়েল নিয়ে যুদ্ধ করেছেন? ক'জনই বা অশ্বারূঢ়া হয়ে অশ্বের ক্ষুরে পথের ধূলি উড়িয়েছেন? ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল, বাস্কেটবল বা অ্যাথলেটিকসের একটু আধটু চর্চা তো অনেকেই করে। কিন্তু অ-নিয়মের স্পোর্টসে যে নিয়মের বাঁধ-ভেঙ্গে নিপুণ হতে চায় সে অ-সাধারণ বইকি! শুধু খেলাধূলাই তো নয়, সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়া; শিল্প নৈপুণ্যেও দক্ষতা।

রবিনার শৈশব জীবন কেটেছে দার্জিলিংয়ে। ওখানকার লরেটোয় পড়বার সময় শিখেছে রোলার স্কেটিং ও হকি খেলা। দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবে স্কেটিং করবার সময় হাঁটুতে চোট লাগে। কিন্তু তাতে খেলাধূলায় তেমন বাধার সৃষ্টি হয়নি। রবিনা তখন বারো-তেরো বছরের মেয়ে। খেলাধূলায় দক্ষ হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় অল্প সময়ের মধ্যেই পা ঠিক হয়ে যায়। তারপর আরম্ভ হয় হকি খেলা ও অশ্বচালনা। সেণ্ট পলসের ছেলেদের কাছ থেকে হকির প্রথম পাঠ আগেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। তারপর ডাউ হিল, মাউণ্ট হারমন, সেণ্ট জোসেফ, কনভেণ্ট ও লরেটোর ইণ্টার স্কুল হকি প্রতিযোগিতায় লরেটোর লেফট হাফে নিয়মিত খেলার সুযোগ ঘটেছে রবিনার। কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে একটু নামও ছিল। কলকাতায় আসবার পর এখানকার ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবও আদর করে দলে টান্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে এবং টেব্‌ল টেনিসের সময়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় দু'একটি খেলায় যোগ দেওয়া ছাড়া নিয়মিত খেলার সুযোগ ঘটেনি।

অশ্ব চালনায় পারদর্শিতা অর্জনও দার্জিলিংয়ে। তবে রেস হর্সে চড়ে ঘোড়দৌড়ের রেস নয়—রেস হর্সে শখের রেস। পরিবারের

প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। মা বাবা ভাই বোন সবাই মিলে দশ পনেরো মাইল সকালে ঘুরে আসা।

দার্জিলিং থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাসের পর কলকাতার লরেটো হাউসে ভর্তি এবং বাস্কেটবল, টেব্‌ল টেনিস ও ফেন্সিং শেখা।

ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাবের কয়েকজন প্রতিনিধি যখন লরেটোর মেয়েদের ফেন্সিং শেখাবার জন্য এগিয়ে এলেন তখন বেশ কিছু মেয়ে জুটে গেল। পড়ার পর খেলা। মুখে মুখোস, হাতে অসি, সব মেয়ের বীরাঙ্গনা বেশ। সে এক সুন্দর দৃশ্য ; তার মধ্যে রবিনার রমণীয় সৌন্দর্য। দোহারা দীর্ঘদেহী রবিনা অল্প সময়েই অসি চালনায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ইণ্টার কলেজ বাস্কেটবল খেলাতেও কলেজ টীমে তার জায়গা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। স্কটিশ, বেথুন, গোখেল প্রভৃতি কলেজের সঙ্গে লরেটোর খেলায় রবিনা অপরিহার্য।

টেব্‌ল টেনিসের প্রথম তালিমও কলেজের কমনরুমে। সহ-পাঠিনী ঊষা আয়েঙ্গারই ওর অনুপ্রেরণা। কমনরুমে লেজার পিরিয়ডে একটু আধটু খেলা, তারপর রাজকুমারী অমৃত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার কোচ শিবরামনের কাছে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ। মাত্র দু'মাসের শিক্ষা-কেন্দ্র। এটা ১৯৪৮-এর শেষদিকের কথা। ১৯৫৯-এ ওয়াই এম সি এ চৌরঙ্গীর সভ্যা। কিন্তু বাধা এল সাংসারিক কারণে। অসুখ বিসুখের জন্য পাঁচ মাস হাতে টেব্‌ল টেনিসের ব্যাট উঠল না। নিয়মিত খেলার সুযোগ বলতে মাত্র দু'বছর। ১৯৫৯-এর শেষভাগ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত।

এর মধ্যে যেটুকু কলা-কুশলী হওয়া যায় তার চেয়ে একটু বেশি নৈপুণ্যেরই অধিকারিণী রবিনা। তবে জীবনে বড় সাফল্য বেশি নেই। ব্যর্থতাই বেশি। সাফল্যের পাদপ্রান্তে এসে পা ফসকে গিয়েছে বহুবার। তবু ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়েননি।

কলেজ স্ট্রীট ওয়াই এম সি এতে জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতার

প্রথম রাউণ্ডে হেরেছেন তপতী মিত্রের কাছে। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-র দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় বোম্বের অখ্যাত মেয়ের কাছে দ্বিতীয় পরাজয়। ১৯৫৯ সালে জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে প্রথম খেলার সুযোগে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-বিজয়িনী মীনা পরাণ্ডে। হেরেছেন, এবং স্ট্রেট সেটেই হেরেছেন। ব্রাবোর্ন লীগ, কলেজ চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় দলগত খেলায় কিছু কিছু কৃতিত্বের নজির না আছে, এমন নয়। কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।

সেণ্ট্রাল টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উঠেও উষা আয়েঙ্গারের বিরুদ্ধে জিততে পারেন নি। ওয়াই এম সি এ-র ফাইন্যালে উষার কাছ থেকে প্রথম দুটি সেট নিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছেন। ভবানীপুর বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে শকুন্তলা দত্তর কাছে হার, আবার কাশিমবাজার প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে শকুন্তলার হার রবিনার কাছে, ফাইন্যালের বিজয়িনী উষা আয়েঙ্গার। তাই বলছিলাম সাফল্যের পদপ্রান্তে এসেও পা ফসকে গিয়েছে বহুবার।

কেন এই ব্যর্থতা? হাতে চোস্ত মা'র আছে, মারের মধ্যে আছে শাণিত শক্তি, চটুল পদক্ষেপ, দেহের সুন্দর ভারসাম্যের মধ্যে সুন্দরতর মারের ভঙ্গি, ডিফেন্সও চমৎকার। তবু বড় সাফল্যের দ্বারে বার বার ব্যর্থতা। কারণ কি? না, টেম্পারামেণ্টের অভাব। খেলার মধ্যে সব আছে শুধু ঐ বস্তুর অভাব। এক সঙ্গে দুটো মা'র ভাল হল তো তৃতীয় মারের বেলায় মাথা খারাপ। যাচ্ছেতাই ভাবে ব্যাট চালিয়ে দিলেন, দেখলেন না বলে কতখানি স্পিন আছে বা প্রতিদ্বন্দ্বির দুর্বলতা কোথায়। কোনভাবে খেলা শেষ করতেই যেন শশব্যাস্ত। এ টেম্পারামেণ্ট নিয়ে বড় খেলা জেতা শক্ত।

'টেম্পারামেণ্ট' অর্থাৎ মানসিক স্থৈর্য ও ধৈর্য যে খেলার কত বড় জিনিস তা হৃদয় দিয়ে অনুভব না করা পর্যন্ত সেটা আয়ত্তে আসতে চায় না।

ক'বছর আগের একটা ঘটনা বলছি। ইডেন গার্ডেনে ইস্ট ইণ্ডিয়া টেব্‌ল টেনিসের আসরে সরোজ ঘোষের সঙ্গে আইভান আন্দ্রিয়াদিজের প্রতিযোগিতা। বোধহয় কোয়ার্টার ফাইন্যাল হবে। বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় আন্দ্রিয়াদিজের তুলনায় সরোজ ঘোষকে টেব্‌ল টেনিসের শিশু বলা যায়। কিন্তু ঐ শিশুর কাছেই হারতে বসে-ছিলেন আন্দ্রিয়াদিজ। আমরা চোখ চেয়ে দেখছি একটা মহীরুহের পতন ঘটছে। উদ্যোক্তাদের মুখ পাংশুবর্ণ। কারণ আন্দ্রিয়াদিজ হারলে আসর খতম। আর লোক আসবে না খেলা দেখতে। উদ্যোগীদের আর্থিক ক্ষতির দায় বহন করতে হবে। কিন্তু হারলেন না আন্দ্রিয়াদিজ। সরোজ ঘোষ পর পর ছ'টি সেট পাবার পর তৃতীয় সেটে যখন ৬—২ পয়েন্টে এগিয়ে তখন খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন আন্দ্রিয়াদিজ। মারের 'ব্লিৎস্‌ক্রিগে' নয়। মা'র ঠেকানোর আনাড়ি সুলভ খেলায়। আন্দ্রিয়াদিজ তখন যেন টেব্‌ল টেনিসের বুড়ো-শিশু। কেবল খেলা শিখে খেলতে এসেছেন। সরোজের ভুলে একটি একটি করে পয়েন্ট আসতে আরম্ভ করলো। নিজের উপর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে আন্দ্রিয়াদিজও মারতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত আন্দ্রিয়াদিজই হলেন বিজয়ী।

একেই বলে টেম্পারামেণ্ট। একে হৃদয় দিয়ে অনুভব না করলে, প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসলে এ বস্তু বশে আসে না। তবে রবিনার খেলার টেম্পারামেণ্ট এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত। অদূর ভবিষ্যতে বড় সাফল্যও অনিবার্য।

লরেটো থেকেই ইণ্টারমিডিয়েট পাস করবার পর ওখানেই এখন রবিনা ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। সহপাঠিনী এবং সহখেলোয়াড় উষা আয়েঙ্গারের মত রবিনারও বি-এর ইংরাজীতে অনার্স। তবে ইণ্টার-মিডিয়েটের পর উষা এসেছে প্রেসিডেন্সীতে—রবিনা ওখানেই থেকে গেছে।

পড়াশুনা ও অঙ্কনে রবিনার অসম্ভব আগ্রহ। পেন্সিল স্কেচই

হাতে ভাল ফোটে, তুলির টানেও হাত ভাল। ও বিদ্যায় ওদের জন্মগত অধিকার। বাবা কুমার তুষারকুমার রায়ও শিল্পী। তাছাড়া পরিবারের অনেকেরই ঐ নেশা। পিয়ানো বাজনায় রবিনার লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজের সার্টিফিকেট।

খেলার নেশাও হয়তো পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত। কে না জানে দীঘাপাতিয়ার রাজপরিবারের ক্রীড়াপ্রিয়তার কথা? সব খেলাতেই ওদের আগ্রহ ছিল। নিজেদেরই ছিল ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট টীম। রবিনার রক্তের মধ্যেই আছে খেলার নেশা। শুধু এদেশেরই নয়। বাপঠাকুরদা পদ্মার আবহাওয়ায় মানুষ। মা শ্রীমতী উইনফ্রেড রায় ইংলিশ চ্যানেলের কোলে লালিতা পালিতা, ইংরেজ দুহিতা। তাই রবিনার স্বভাব, সৌন্দর্য, চালচলন, ক্রীড়াপটুতা, সব কিছুর মধ্যেই দুই দেশের ছাপ।

কিছুটা ইংলিশ চ্যানেল ও কিছুটা গঙ্গা-পদ্মার প্রভাব। খেলা-ধুলা, লেখাপড়া ও শিল্পসাধনার ত্রিবেণী সঙ্গমে সঙ্গীতমুখর জীবন দীঘাপাতিয়ার রাজ পরিবারের কন্যা রবিনা রায়ের।

সুপ্তোত্থিতা



গীতা রায়

ভারতের সপ্তম জাতীয় রাইফেল শুটিং-এর আসর। রাজা-মহারাজা আর ভারতের মহা মহা শুটাররা সমাগত। শুটিং-এর মহারথী মেয়েরও অভাব নেই। দশ দিন ধরে রাশি রাশি রাইফেল, রিভলবার ও পিস্তলের গুড়ুম গুড়ুম ও পটাপট আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার পর পুরস্কার বিতরণের পালা। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ।

এক একটি বিষয়ে পুরস্কার-প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে আর এক একজন করে পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছেন। মাইকের ঘোষণা ঃ

"পয়েন্ট টু টু ফ্রি রাইফেল থ্রি পজিশন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, লেডিস ইভেন্ট, এগ্রিগেটে—প্রথম, গীতা রায়, প্রোনে—প্রথম, গীতা রায়, নীলিংয়ে—প্রথম, গীতা রায়, স্ট্যাণ্ডিংয়ে—প্রথম, গীতা রায়।"

"টীম চ্যাম্পিয়নশিপ—ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন 'এ' টীম—গীতা রায়, হরিচরণ সাহা ও ডাঃ হরিহর ব্যানার্জী।"

"স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল থ্রি পজিশন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ফর লেডিজ—এগ্রিগেট গীতা রায়, প্রোন—গীতা রায়, নীলিং—গীতা রায়, স্ট্যাণ্ডিং—গীতা রায়।"

"স্ট্যাণ্ডিং রাইফেল প্রোন পজিশন চ্যাম্পিয়নশিপ, লেডিজ ইভেণ্ট—প্রথম, গীতা রায়।"

এই ভাবে এক একটি করে ১৪টি সোনার মেডেল পেলেন মেয়েদের বিভাগের চ্যাম্পিয়ন বাঙলার রাইফেল-চালিকা গীতা রায়। সঙ্গে তিনটি ফাউ। দুটি রূপোর ও একটি ব্রোঞ্জের মেডেল। একটি মেয়েকেই পুরস্কার বিলোতে প্রায় হাঁফিয়ে উঠলেন ৭৩ বছরের দেশ নায়ক প্রবীণ পন্থজী। এক সময়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'সাবাস বেটি'।

টালীগঞ্জের পুলিস রেঞ্জে ষষ্ঠ বার্ষিক অল ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিং কম্পিটিশনে প্রায় একই অবস্থা। সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা বাঙালী মেয়ে গীতা রায়ের বারবার সভাপতি সমীপে আগমন ও প্রস্থান। এখানেও গীতা রায়কে পুরস্কার বিলোতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন বাঙলার স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী। 'অল ইণ্ডিয়া' ও 'ন্যাশনাল' দুই জায়গাতেই গীতা রায়ের চ্যাম্পিয়নশিপ। এটা ১৯৬০ সালের কথা।

তার আগে বাঙলা, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ ও দিল্লির শুটিং রেঞ্জে নেহরু, মবলঙ্কর, মোরারজী ও মাঝিতিয়ার হাত থেকে গীতা রায় রাইফেল শুটিং-এর কত পুরস্কার লাভ করেছেন তার হিসাব মেলানো একজন হিসাবনবিসের পক্ষে দুই এক দিনে সম্ভব নয়।

শুধু কি রাইফেল শুটিং-এর পুরস্কার? দমদমের ৬।১ রাজাবাগান লেনে গীতা রায়ের এখনকার বাড়িতে দুই তিন আলমারি ঠাসা পুরস্কারের অরণ্যে অন্য পুরস্কারেরও অভাব নেই। বাঙালী রমণীর রোয়িং-পটুতা এবং পারিপাটি করে পুষ্পোদ্যান রচনারও নিদর্শন রয়েছে সেখানে। ফ্লাওয়ার শোতে বহু পুরস্কার ও প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসাবে রোয়িং-এ বিজয়িনীর সম্মানও পেয়েছেন গীতা রায়। খেলাধূলায় হাত আছে, অথচ হাতে পুরস্কার আসেনি যেসব খেলা থেকে তা হচ্ছে—টেব্‌ল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, সুইমিং ও এণ্ডিওরেন্স

মোটর রেসিং। হান্টিং অর্থাৎ শিকারের পুরস্কার—একটা আস্ত বাঘের মাউণ্ট করা মাথাও ঘরে আছে। তবে সেটা শিকারের কৃতিত্ব স্বামী দিব্যনাথ রায়ের। শিকারের সঙ্গী গীতা রায়কে কো-হাণ্টার বলা যেতে পারে। এণ্ডিওরেন্স মোটর রেসিং-এ ড্রাইভার গীতা রায়ের কো-ড্রাইভার ছিলেন যেমন স্বামী দিব্যনাথ রায়।

খেলাধূলা ও অ্যাডভেঞ্চারে একটি মেয়ের, মেয়ে কেন, বাঙালী ঘরের ঘরনীর এমন পটুতা সত্যিই বিরল। অথচ বিশ্বাস করুন গীতা রায়ের কুমারী জীবনে খেলাধূলার 'খ' অক্ষরজ্ঞানও ছিল না। ছোটবেলায়ও না। কমলা গার্লস স্কুলের ছাত্রী হিসাবেও না। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পরও তিনি খেলাধূলায় নিরাসক্ত মেয়ে। ১৯৪৩ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হবার পর তাঁর মুক্ত অঙ্গনে মুক্তি। ক্রীড়ানুরাগী স্বামী দিব্যনাথ রায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় একসঙ্গে অনেক রকমের খেলাধূলার ঐকতান। তবু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে ঐকতানে না ছিল ছন্দ, না ছিল সুর, না ছিল তান।

ছন্দ এল ১৯৪৬ সালে ঢাকুরিয়া লেকে ছন্দোময় নৌচালনায় 'পেয়ার ওরসে' ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের ইংরেজ দুই তরুণীকে পরাজিত করবার পর। রোয়িং-এ বাঙালী মেয়ের প্রথম সাফল্য। মেয়েদের 'ফোরস' অর্থাৎ ৪ দাঁড়ের প্রতিযোগিতাতেও ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের চারজন ইংরেজ তরুণীর বিরুদ্ধে লেক ক্লাবের জয়লাভে গীতা রায়ের এক-চতুর্থাংশ সম্মানের ভাগ।

রোয়িং-এর জন্য সাঁতার জানার প্রয়োজন। নৌকো চালাবার সময় জলে পড়লে তুলবে কে? তাই রোয়িং-এর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে সাঁতার শিখতে আরম্ভ করলেন গীতা রায়। সাঁতারের সঙ্গে সুর মিশে ওখানে জলনাটিকা অভিনীত হল।

খেলায় তান এল লেক ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন ও টেব্‌ল টেনিসের চর্চা

আরম্ভের পর। এবার মেপে মেপে শট। কানের শব্দ ও চোখের দৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা সুসামঞ্জস্য। তুই খেলাতেই কিছুটা দখল। কিন্তু যে স্পোর্টসে গীতা রায়ের জীবনের জয়গান, সে স্পোর্টস তখনও আরম্ভ হয়নি।

১৯৫১ সাল থেকে আরম্ভ হল সে স্পোর্টস। সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের টালীগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে তিনি আর সব বাঙালী, অবাঙালী, ইংরেজ ও ইহুদী মেয়েদের হারিয়ে অল ইণ্ডিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন। 'প্রোন' অর্থাৎ শায়িত অবস্থায় পঁচিশ, পঞ্চাশ ও একশো মিটার দূরত্বের গুলি ছোঁড়ায় কেউই তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে তিনি উপরে উঠতে আরম্ভ করলেন। মেয়েদের মধ্যে ভারতে তিনি এখনও এক নম্বর রাইফেল-চালিকা।

গীতা রায় টেলীস্কোপিক রাইফেল চালনায় পুরুষ-মেয়ের প্রতিযোগিতায় ভারতে কোন দিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান দখল করেননি, প্রোনে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একাধিকবার প্রথম হয়েছেন, তুবার লাভ করেছেন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে।

১৯৫৬ সাল রাইফেল-জীবনের স্মরণীয় বছর। এ বছর অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রোনের ৭০০ নম্বরের মধ্যে শতকরা ৯৮ নম্বর পেয়ে লাভ করেছিলেন 'গোল্ড ব্যাজ'। এক সুনীল গাঙ্গুলী ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউই যা লাভ করতে পারেন নি।

এ ছাড়া এ বছরের অলিম্পিক ট্রায়ালে তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যদিও প্রোন, নীলিং ও স্ট্যাণ্ডিং অর্থাৎ শুয়ে হাঁটু গেড়ে ও দাঁড়িয়ে তিন রকমের সুটিং ছিল ট্রায়ালের অন্তর্ভুক্ত। তবু শুধু প্রোনে গীতা রায় করেছিলেন রেকর্ড সংখ্যক স্কোর। ৫০ মিটার দূর থেকে ৬০ রাউণ্ড গুলি চালনায় ৬০০র মধ্যে পেয়েছিলেন ৫৯৮। তবু মেলবোর্ন অলিম্পিকের শুটিং-এ তাঁর স্থান

হল না। অথচ মেলবোর্নে ৫০ মিটারের প্রোনে যিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তাঁর স্কোর গীতা রায়ের ট্রায়ালের স্কোরের কম। গীতা রায়কে অলিম্পিকে পাঠালে আমরা একটা ব্রোঞ্জ মেডেল নিশ্চয়ই পেতাম। অনুশীলনে গীতা রায় আরও পটু হয়েও উঠতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারতাম রূপো বা সোনার মেডেল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সে আশার সুযোগ ঘটেনি।

গতবার অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রোনে শতকরা ৯৬ নম্বর পেয়ে গীতা সিলভার ব্যাজ লাভ করেছেন। রাইফেল অভিজ্ঞদের মতে এখনকার সিলভার ব্যাজের মূল্য আগের গোল্ড ব্যাজের চেয়েও বেশী। কারণ এখানকার স্কোর কার্ডের মধ্য-বৃত্ত অনেক ছোট হয়ে গেছে। নয়া পয়সার আকারেরও একটু ছোট। ২৫ বা ৫০ মিটার দূর থেকে গুলী চালিয়ে সব গুলী মধ্য-বৃত্ত দিয়ে বিদ্ধ করা এখন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

রাইফেল চালনা গীতা রায়ের প্রধান স্পোর্টস হলেও সব খেলাধূলায় তাঁর পরিপূর্ণ আগ্রহ। খেলাকে ভালবাসেন এবং খেলতে ভালবাসেন বলে এখনও তাঁর টেব্‌ল টেনিসে নিয়মিত অংশ গ্রহণ।

কিছু আগে মোটর রেসিং-এর কথা বলছিলাম না? অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের এণ্ডিওরেন্স ও রিলায়েবিলিটি ট্রায়ালে তার অংশ গ্রহণ ১৯৫৬ সালে, যেবার চিত্রতারকা মঞ্জু দে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে-ছিলেন। সবার দৃষ্টি ছিল দুখানি গাড়ির ওপর। একখানি মঞ্জু দের গাড়ি, অপরখানি ডব্লিউ বি ডি ৭৭১৬ নম্বরের 'ল্যাণ্ডমাস্টার', যার মালিক রাইফেল শুটার গীতা রায়। কলকাতা থেকে রাঁচি পর্যন্ত গিয়ে কলকাতাতেই গাড়ির ফিরে আসবার কথা। হাজারীবাগের একটু আগে গীতা রায়ের গাড়ির কল বিকল হওয়ায় আর প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয়নি।

আগেই বলেছি পরিপাটি করে পুষ্পোদ্যান রচনা করা গীতা

রায়ের এখনকার বড় শখ। অ্যাসেমব্লি হাউসে ও হাওড়ায় বার্ষিক 'ক্রিসেনথিমাম' প্রদর্শনীতে তাঁর বাগানের চন্দ্রমল্লিকা বহু পুরস্কার ঘরে তুলেছে।

স্পোর্টসের চর্চা, পাঁচ সাতটা রাইফেল রিভলভার ও ফুলের পরিচর্যা ছাড়া গীতা রায় সঙ্গীতের একটু-আধটু সাধনাও করেন। যে আঙ্গুল দিয়ে তিনি বন্দুকের মুখ দিয়ে আগুন ছোড়েন, সেই আঙ্গুলেই সরোদে তোলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের মিষ্টি সুর। তবে সবার উপরে রাইফেলের স্থান।

অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা বিবাহিত জীবনে একটি মেয়ে কত দিকে সাফল্য অর্জন করতে পারে গীতা রায় তার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। সাধনার শেষ নেই। এখনো চলছে রাইফেলের নিয়মিত অনুশীলন। লক্ষ্য—টোকিও অলিম্পিক।

খেলাধুলার খেয়ালী মেয়ে



নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

—ক্রিকেট খেলার টিকিটের অভাব বাড়িয়েছে মেয়েরা আর মাড়োয়ারীরা।

—মেয়েরা মানে ?

—আপনারা তো ক্রিকেটের 'ক'ও বোঝেন না, কি করবেন একটা টিকেট আটকে রেখে ?

—আপনি বোঝেন ?

—আহা, এটা বুঝছেন না যে, খেলাটা এতো ভীষণ কম্‌প্লিকেটেড যে নিজে না খেললে ঠিক বোঝা যায় না।

—আপনি কি ক্রিকেট খেলেছেন কোনদিন ? অত দূরে না-ই বা গেলেন—ডাংগুলি খেলেছেন কখনো ? আপনি কতটা বোঝেন ?

—মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। খুব তো ক্রিকেট-ফ্যান হয়েছেন। বলুন তো পৃথিবীতে রান আউটের বল কে সব চেয়ে ভাল দিতে পারে ?

—সেই পৃথিবী বিখ্যাত বোলার আপনিই। আচ্ছা আপনি এবার বলুন তো 'সিলি-মিড-অন' কাকে বলে ?

—খুব নামগুলো শিখেছেন দেখছি...।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত সংলাপ ক্রিকেট রসিক কোন ছেলেমেয়ের সত্যিকারের ঝগড়া নয়—এক পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিকেট সম্বন্ধে লেখা এক লেখিকার রম্য রচনার অংশ বিশেষ।

শুধু ক্রিকেট সম্বন্ধেই লেখার আগ্রহ নয়, সত্যিকার খেলার সময় মাঠে বসে ক্রিকেটের স্কোর লিখতেও এই লেখিকার সমান আগ্রহ। সমাজ সংসারের সাথে খেলাধূলা মিশিয়ে তার জীবনের·কলরব।

বালীগঞ্জে দুই নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের পেছনের ফ্ল্যাটে পা দিলেই এর পরিচয় মেলে। প্রথমেই চোখে পড়ে এই পরিবারের ক্রীড়া-প্রীতি ও শিল্প-প্রীতির পরিচয়। আলমারিতে কাপ, মেডেল, ক্রেস্ট, ট্রফি থরে থরে সাজানো। অ্যাথলেটিকস, টেব্‌ল টেনিস, ক্রিকেটের পুরস্কার। ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত আরও বহু কৃতিত্বের নজির। তবে একক কৃতিত্বে নয়। কিছু নিজের, কিছু পার্টনারের। জীবনের পার্টনার। স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম কৃতিত্বের সব সাক্ষী, যদিও পৃথকভাবে সংগৃহীত।

স্ত্রী নীলিমা সেন এখন লেখিকা। শিক্ষিকাও। নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিত। বিবাহিত জীবনের উপাধি 'সেনের' সঙ্গে কুমারী জীবনের উপাধি গঙ্গোপাধ্যায় যেমন জড়িত, তেমন খেলার মাঠ থেকে হারিয়ে গেলেও খেলার মন সদাজাগ্রত।

ইতিহাসে রাজা বাদশার কথা ছড়াছড়ি যায়। আর রূপকথায় শোনা যায় হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়ার গল্প। সেই রকমই উত্তর কলকাতার এক অভিজাত পরিবারের ঝাড়লণ্ঠনের আলো যখন নিবু নিবু তখন নীলিমা জন্মেছিল। এ পরিবারের প্রথম কন্যা। রক্ষণশীল, গোঁড়া বাড়ি। বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হাউইয়ের মতো ঐশ্বর্য চলে গিয়েছিল এ বাড়ি থেকে; কিন্তু এ বাড়ি সুরের, এ বাড়ি খেলার, এ বাড়ি আর্ট ও সাহিত্যের। বাবা শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার বিখ্যাত কালীবাবুর আখড়ায় ব্যায়াম চর্চা করতেন; অন্য সময়ে পিয়ানো আর ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন এবং অবিরাম বই পড়তেন। তিনি অল-বেঙ্গল ওয়েট লিফ্‌টিং কম্পিটিশনে ফেদার-ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছিলেন।

মা শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় জোড়াসাঁকোর সুন্দরী মেয়ে। তিনি লেখেন কবিতা। 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মা বললেন—আমার মেয়ের রূপ নেই অতএব একে বিদুষী করতে হবে। তাই তিন বছর বয়স হতে না হতেই ভর্তি করে ছিলেন শ্যামবাজারের এক স্কুলে। পরে বেলতলা গার্লস স্কুল থেকে অত্যন্ত অল্প বয়সেই ম্যাট্রিক পাশ করে নিল নীলিমা। খেলাধূলো শুরু হলো আশুতোষ কলেজে যাবার পর।

আট ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ভাইবোনেরা প্রত্যেকেই খেলাধূলা, নৃত্য-গীত, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী।

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও এবং অভিভাবকদের সম্পূর্ণ অনুমতি না থাকা সত্বেও নীলিমা অকস্মাৎ বাঙলার মাঠে নেমে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালে অল বেঙ্গল উইমেন্স স্পোর্টসে কলেজ ইভেণ্ট—৭৫ মিটার, ১০০ মিটার দৌড় এবং লঙজাম্পে প্রথম হয় এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে মিঃ কেসীর নামাঙ্কিত গভর্নর পুরস্কার পায়। সে বছরে নীলিমা জীবনে প্রথম হার্ডল করে। নীলিমা তার আগে সিনেমায় ঘোড়ার হার্ডল ছাড়া আর কিছু দেখেনি; হার্ডল করা তো দূরের কথা। দৌড়বিজয়িনী হয়ে যখন মাঠের উপর জখম-হওয়া ডানপায়ের তদারক করছে তখন স্পষ্ট শুনতে পেল—কারা যেন বলাবলি করছে—'হে ভগবান ও মেয়েটার পা যেন আরো ফুলে যায় ও যেন হার্ডল না করতে পারে।'

হিটসে সেই প্রথম জখম-পা সুদ্ধু ৮০ মিটার লো হার্ডল রেস জয় করলো নীলিমা ১৪ সেকেণ্ডে। কিন্তু ঈশ্বর হয়তো বিরুদ্ধ দলের মেয়েদের আকুল মিনতি শুনেছিলেন। কারণ ফাইনালে পর পর তিনটি হার্ডল টপকে তিনবার পড়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল নীলিমা।

অল বেঙ্গলের কলেজ ইভেণ্টের পরদিনই প্রাদেশিক স্পোর্টস। ডান পা তখন ফুলে বিশ্রী হয়ে গেছে; তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো

নীলিমা এবং ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড় এবং লঙজাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো।

১৯৪৬ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ; অতএব খেলাধূলা বন্ধ। এই বছরে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ভাষার জন্য বিশেষ পুরস্কার 'নগেন্দ্র-গোল্ড-রিমড্ সিলভার মেডেল' লাভ করল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়তে শুরু করল। কিন্তু খেলার মাঠ জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। আশুতোষ কলেজের রক্ষণশীল অধ্যক্ষ বলতেন—"মা লক্ষ্মী এত দৌড়িও না, সংসারে অলক্ষণ হয়।" '৪৮ সালে বি এ পাস করল পাসকোর্সে। খেলাধূলায় উৎসাহ লেখাপড়ায় কিছুটা বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কলেজ অধ্যক্ষ মুখে বলতেন—"আগে পড়ো তারপর খেলার অনেক সময় পাবে"। তবু ১৯৪৭ সালে যখন নীলিমা অল বেঙ্গল (কলেজ ইভেণ্ট) ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে টিম চ্যাম্পিয়ন আনার সাহায্য করল তখন আনন্দের সঙ্গে তিনি কলেজ ছুটি দিয়েছিলেন। নীলিমা ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও লঙ্জাম্পে প্রথম হল। এবং রিলে-বিজয়ের সাহায্য করে সে বছরে লর্ড বারোজ-এর নামে গভর্নর-এর পুরস্কার লাভ করল।

১৯৪৮ সালেও একই ব্যাপার। অল বেঙ্গলে ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান। লঙ-জাম্পে একটা দুঃখ রয়ে গেল। প্রায় ১৬ ফিট একটা জাম্প লাইনে পা লাগার দরুন ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেল ; অবশ্য লঙ-জাম্পেও প্রথম স্থান লাভ করেছিল সে বছর। তবু সেই রেকর্ড করতে না পারার দুঃখ সারাজীবনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। কলেজ টিম এবারেও রিলে-বিজয়ী এবং চ্যাম্পিয়ন হল। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে এ বছরে নীলিমা গভর্নর রাজা-গোপালাচারী প্রদত্ত সার্টিফিকেট পেল।

'৪৮ সালের পর আশুতোষ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এল

নীলিমা এবং ইংরাজী 'বি গ্রুপে' পড়তে লাগল। খেলার মাঠের ইতি ঐখানেই।

অ্যাথলেটিকস ছাড়া বাস্কেটবল ও হকি খেলায় উৎসাহী ছিল সে। কলেজের স্পোর্টসে পরপর চার বছর ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল এবং প্রত্যেকবারই ব্যাডমিণ্টন, টেনিকয়েট ও টেব্‌ল টেনিসে কখনও উইনার্স কখনও রানার্স-আপ হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে আশুতোষ কলেজের রজত-জয়ন্তী, স্পোর্টসে আবার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ। এখনও ব্যাডমিণ্টন ও টেব্‌ল টেনিস খেলে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে।

খেলাধূলা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ প্রচুর। শৈশব থেকেই লাঠি খেলায় পারদর্শিতা ; বড় হয়ে হারোয়া ও বেনিটি খেলত।

ছবি আঁকার ধারা পেল অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রী মাতামহী স্বর্গীয়া সাহানা দেবীর এবং পিতামহ স্বর্গীয় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ছিলেন গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্টসের প্রথম গ্রুপের ছাত্র। হ্যাভেল সাহেবও অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তাঁর কাছে আঁকা শিখত নীলিমা। পরে বিখ্যাত শিল্পী শৈলজ মুখার্জির ছাত্রী হল। ১৬ বছর বয়সে কিশোর-বঙ্গ চিত্র প্রদর্শনীতে নীলিমার তেল-রঙা একটি ছবি প্রথম পুরস্কার পায়। পরে এম এ পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেণ্ট আর্ট একজিবিশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এ ছাড়া মৌচাক, রংমশাল, দীপালী প্রভৃতি পত্রিকা থেকে আঁকার জন্য পুরস্কার মিলেছিল কৈশোরে।

সাহিত্যের প্রেরণা মাতৃ-বন্ধু শিশু-সাহিত্যিকা শ্রীইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে। পরবর্তীকালে উৎসাহ দিয়ে সাহিত্যের জগতে বার করে আনলেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, বসুধারা, মহিলা, মহিলামহল, বেগম ইত্যাদিতে বহু লেখা ও আঁকা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণিমা ও মহিলামহল পত্রিকাতে

খেলাধূলার সম্পাদনা করেছে নীলিমা সেন। সে দিক দিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকও বলা যায়।

বিয়ে হয়েছে ১৯৫১ সালে শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে। অশোক সেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী চাকুরে। খেলাধূলায় অপরিসীম উৎসাহ তাঁর। এক সময় হকি ও ফুটবলে প্রচুর উৎসাহ ছিল, এখনও ক্রিকেট খেলেন। অবসর সময়ে কাঠ কেটে জাহাজ বানান, মাটির মূর্তি তৈরী করেন।

নীলিমাও ক্রিকেটের অনুরাগী। ইডেনগার্ডেনের কোন টেস্ট ম্যাচ না দেখে বাড়িতে চুপ করে থাকবে না কিছুতেই। ম্যাডক্স-স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেটে অশোক সেন যখন খেলে তখন অফিশিয়াল স্কোরারের চেয়ারে বসে নীলিমা স্কোর লেখে টিমের হয়ে।

নাচে এবং তারের বাজনায়ও কিছুটা দখল ছিল নীলিমা সেনের। কিন্তু কোন কিছুতেই পাকাপাকি মন বসেনি। খেয়ালের বশেই সব কিছুতে আগ্রহ।

খেলাধূলার খেয়ালী ও গোছো মেয়ে নীলিমা হারিয়ে গেছে। নীলিমা এখন মর্ডান হাই স্কুলের শিক্ষিকা ও গাইডার। লেখিকাও। বলেন "লিখে বেঁচে থাকবো পৃথিবীতে।" তবু বাবার বন্ধুরা এখনও বাবাকে পিঠ চাপড়ে বলেন—'প্রাউড ফাদার অব্ এ গেছো মেয়ে।'

জল-পরী



রিনা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী)

কিছুদিন আগে মহাজাতি সদনের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক চিত্র-প্রদর্শনী। উদ্দেশ্য শিক্ষায়, দীক্ষায়, কলা, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সমাজ-সেবায়, অভিনয়ে, পর্বতারোহণে, এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রে যাদের উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা, তাদের অমৃত-মুহূর্তের চিত্র সবার চোখের সামনে তুলে ধরা। এক কথায়, ছবির মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কৃতিত্বের সংকলন। বলা বাহুল্য, খেলাধূলার ছবিও এই প্রদর্শনীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল এবং খেলাধূলায় বাঙলার যেসব ছেলে-মেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরতি সাহা, ভারতী সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, অনুরাধা গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি সাঁতারের সাবলীলা মেয়ের ছবি। কারো গায়ে ক্লাবের ব্লেজার, কারো অঙ্গে সুইমিং কস্টিউম। মাঝখানে একখানি ছবি রিনা ব্যানার্জির। যেন ঘরের মেয়ে।

ছবি দেখে নানা জনের নানা মন্তব্য। কেউ ছায়া দেখে কায়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ প্রশংসায় অনুদার—কারো বা কটাক্ষ বক্র।

'রিনার ছবি কেন এখানে?' একটি মেয়ে যেন চমকে উঠল। আর একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল 'সুন্দরী বলে'।

মেয়েটির সঙ্গী, হয়তো দাদা কিম্বা ভগিনীপতি হবেন বললেন—হ্যাঁ, সুন্দরের প্রতি মানব-হৃদয়ের সাধারণ দুর্বলতা আছে, কিন্তু তোমরা কি ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া আছে, সেটা পড়ে দেখছ না ?

রিনার ছবির নীচে ইংরাজীতে যে পরিচয় লেখা ছিল, তার মানে করলে দাঁড়ায়—আন্তঃকলেজ সাঁতারের সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন মেয়ে রিনা ব্যানার্জি।

মেয়েটির সঙ্গী আবার যা বললেন তার অর্থ—'রিনা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, সাঁতারেও সুন্দর। সুন্দরতমও বলা যেতে পারে। ওর ওয়াটার ব্যালে ? অপ্রগলভ সৃষ্টি-সুষমার সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সাঁতারের কসরত মিশিয়ে রিনা যখন জলের বুকে কলতান তোলে, রূপে-রসে-ছন্দে তা আশ্চর্য রকমে মোহময় হয়ে ওঠে।

প্রদর্শনীর মেয়েটির মত রিনা ব্যানার্জি সম্বন্ধে অনেকেরই অজ্ঞতা আছে। সত্যিই নামকরা সাঁতারু মেয়েদের মত ওর কৃতিত্বের প্রচার হয়নি, ছবিও বেশি বেরোয়নি কাগজে-কাগজে। পরিচিত মহলেই রিনার পরিচিতি, প্রশংসা, খ্যাতি।

সত্যি কথা বলতে, সন্ধার গতিবেগ, কল্যাণীর কলানৈপুণ্য, কিম্বা আরতির দুঃসাহস রিনার মধ্যে নেই, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রিনা অতুলনীয়া। সাঁতারের আশ্বাস, সামর্থের বিশ্বাস আর কল্পনা-শক্তির বিকাশে রিনা ব্যানার্জি সৃষ্টিশীল শিল্পী। ইণ্টার কলেজ সাঁতারের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ওয়াটার ব্যালের বিভিন্ন চরিত্রের সার্থক রূপায়ন ওর সাঁতার-জীবনের দ্বৈত কীর্তি। তবে উদ্ধত প্রকাশে নয়, প্রকাশ—লাবণ্যে লীলাময়ী।

ঢাকুরিয়া লেকের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির রিনা শ্রেষ্ঠ সাঁতার পটিয়সী বললে প্রতিবাদের ভয় থাকবে। কিন্তু যদি বলি—শ্রেষ্ঠ সাঁতারশিল্পী, কোন প্রতিবাদ উঠবে না।

খেলাপ্রিয় পরিবারের প্রেরণায় রিনা ব্যানার্জির সাঁতারের সূচনা। তবে এর পেছনে ছোট একটু ইতিহাসও আছে। বাবা সুশীলকুমার ব্যানার্জি দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছেন। একবার ওঁদের হুগলীর বাড়িতে, আর একবার বরিশালে বেড়াতে গিয়ে। সেই থেকে তাঁর সঙ্কল্প ছিল ছেলে মেয়েকে সাঁতারে সুপটু করে তুলবেন। তাই রিনা ও সৌরভকে ভর্তি করে দিলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে; রিনার বয়স তখন বারো-তেরো, সৌরভের আট-নয়। নিজেও অনুরাগী হলেন, 'পথে নারী বিবর্জিতা' মতেরও তিনি সমর্থক নন। ফলে সোসাইটিরও লাভ হ'ল।

সুশীলবাবু নিজে ইঞ্জিনীয়ার, 'ব্যাঙ্কো প্রাইভেট' নামে ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের প্রোপাইটার। সুতরাং ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুল, ডাইভিং বোর্ড, ক্যান্টিন, সবকিছু প্রস্তুত ও পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁর উপর। ক্লাব জমজমাট হয়ে উঠল—নলিন মালিক হলেন কোচ। সাঁতারুরও অভাব হ'ল না। প্রতিনিধি-মূলক সাঁতারে রিনা ব্যানার্জি হলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির প্রথম প্রতিনিধি। গর্ব করে বলবার মত না হলেও ওর মাধ্যমেই সোসাইটিতে এল প্রথম সাঁতারের পুরস্কার। তার আগে অবশ্য সোসাইটির আন্ত ক্লাব সাঁতারে এবং এক মাইল প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু প্রাইজ রিনার হাতে এসেছে এবং পরে এসেছে আরও বহু পুরস্কার। মাঝখানে ১৯৫৭ সালে ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি স্পোর্টস বোর্ডের পরিচালনায় প্রথম যে ইণ্টার কলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, রিনা তার চারটি বিষয়েই ফার্স্ট হয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। রিনা তখন গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পরে ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তেমন অনুশীলন সম্ভব হয় না। বি-এ পাশ করার পর 'ওয়াটার ব্যালে'র মধ্যেই বেশী আনন্দের সন্ধান পায়।

অবশ্য ওয়াটার ব্যালেতে রিনার অংশ গ্রহণ ১৯৫২ সাল থেকে।

প্রথমবারে ফরমেশন সুইমিং, পরের বার জলের বুকে সাঁতারের মাধ্যমে নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র রূপায়ন। তারপর পর পর অভিনীত 'মীনার স্বপন পুরী', 'বেহুলা', 'কালীয় দমন', 'ঋতুরঙ্গ,' 'মনসা মঙ্গল,' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই রিনার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় এবং প্রতি অভিনয়ে অপূর্ব অভিব্যক্তি।

ওয়াটার ব্যালের উপযুক্ত মেয়ে। সাঁতারে সুপটু। পাঁচ বছর ধরে কথাকলি নাচ শিক্ষা গোপাল পিল্লাইয়ের কাছে। হাতের আঙুল যেন চাঁপার কলি। বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, টানা-টানা ডাগর দুটি চোখ। সুন্দর অবয়ব। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতের মধ্যে জলতরঙ্গের তালে তালে যখন সাঁতার কাটে, মনে হয় জলের পরী।

প্রচুর—প্রচুর সাঁতারের কসরত দেখাবার সুযোগ আছে ওয়াটার ব্যালেতে। সাঁতার-নৈপুণ্য এবং শিল্পসত্তা মিশে ওয়াটার ব্যালের সৃষ্টি। সঁতারের সঙ্গে সুর-ছন্দ-লয়-তান মিলিয়ে এর মূক অভিনয়। এ-সাঁতারে গতির পাল্লা নেই, নেই পারম্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আছে কষ্টসাধ্য কসরত, আয়াসসাধ্য অঙ্গব্যঞ্জনা। পায়ের নূপুর নিক্কণের পরিবর্তে হস্তপদ সঞ্চালিত জল-কলতান।

ওয়াটার ব্যালেতে একাধিকবার আমার রিনা ব্যানার্জির কৃতিত্ব দেখার সুযোগ ঘটেছে। প্রতিবারই দেখেছি, দর্শকরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। ঐকতানের তালে তালে লুটোপুটি করছে সুর রঙ্গভরে আর জলের পরে সাঁতার কাটছেন রিনা ব্যানার্জি ; শোনা যাচ্ছে সুর ও সাঁতারের মৃদুতম ধ্বনি পর্যন্ত। যখন সাঁতার শেষ, তখন সবার মরমী মনে পূর্বশ্রুত গানের গুঞ্জরন। একটা সুখ-স্বপ্নের আবিলতা।

সাঁতার ছাড়া ব্যাডমিণ্টন এবং টেব্‌ল টেনিসেও রিনা ব্যানার্জির কিছুটা হাত আছে। কিন্তু সেটার উল্লেখ অবান্তর।

রিনা ব্যানার্জির ছোট ভাই সৌরভও সাঁতারে সুপটু হবার নেশায় মশগুল। ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সতেরো বছরের ছেলে এর মধ্যেই কিছুটা পটু হয়ে উঠছে। এ-বছরই বেঙ্গল এমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়র ইভেণ্টে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম হয়েছে। ঐ বিষয়েই নূতন রেকর্ড করেছে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমসে। সৌরভও ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য। ক্লাবের ওয়াটারপোলো টীমের সেণ্টার ফরোয়ার্ডও।

সেদিন পি-৩৪ রাজা বসন্ত রায় রোডে রিনা ব্যানার্জিদের বাড়িতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি—রিনা ব্যানার্জির কল্যাণী বধূর বেশ, সীমন্তে সিঁদুর রেখা। সম্প্রতি ডঃ ধীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে রিনা ব্যানার্জির বিয়ে হয়ে গেছে। সাঁতার-শিল্পীর স্বামী শুধু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট উপাধি পাননি, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসেও পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পুরস্কার। এখন তাঁর সহধর্মিণী প্রকৃত অর্থেই সহধর্মিণী।

রিনা ব্যানার্জি এখন কম্পারেটিভ লিটারেচারে এম-এ পড়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেবাব্রতী



প্রমীলা বসু

খেলাধূলা, হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে প্রথম জীবনে নিজের পূর্ণ আনন্দ, পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীদের সাফল্যে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি। বাঙলার স্পোর্টসের প্রথম ধাপের মেয়ে প্রমীলা বসু আজও স্পোর্টসের পরিচালিকা। দুটি স্কুলের স্পোর্টস ও গেমস-এর টিচার। সকালে গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়ে, দুপুরে লেক স্কুল ফর গার্লস-এ। ওঁর উপরই দুটি স্কুলের মেয়েদের খেলাধূলার সমস্ত ভার। কখনো ড্রিল করাচ্ছেন, কখনো অ্যাথলেটিকসের শিক্ষা দিচ্ছেন, কখনো শেখাচ্ছেন নিয়মানুবর্তিতা। সাজিয়ে গুছিয়ে দল বেঁধে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন অ্যাথলেটিকস অঙ্গনে। কোন সময় বা রোটারী ক্লাবের খেলার আসরে, কোন সময় শ্রীঅরবিন্দ ফিজিক্যাল ডিমনস্ট্রেশনে। মেয়েরা যখন প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফিরছে, তখন খুশির আমেজে, আত্মতৃপ্তির আনন্দে নেচে উঠছে প্রমীলা বসুর মন—ছোটবেলায় নিজে যখন প্রাইজ পেতেন, ঠিক যেন সেই আনন্দ, সেই অনুভূতি।

নিজে স্পোর্টস করেছেন খুব ছোটবেলা থেকে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাঙলার মেয়েদের স্পোর্টসে ওঁর গৌরব-দীপ্ত অধ্যায়।

ফিল্ড ইভেণ্টে দু' হাত ভরে রাশি রাশি প্রাইজ কুড়িয়েছেন বাঙলার বিভিন্ন স্পোর্টস ফিল্ড থেকে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রমীলা বসুর নামের সঙ্গে আর একটি নাম থাকত পাশাপাশি লেখা—হিরণ্ময়ী বসু। যেন দুই বোন। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এক হিসাবে বোনই বটে। শুধু সতীর্থ এবং সহ অ্যাথলীটই নয়, দু'জনই সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী গণেশানন্দের মানসকন্যা।

১৯২৭ সাল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী গণেশানন্দ ঘুরে বেড়াচ্ছেন সরিষার আশ-পাশ পল্লীর মধ্যে। উদ্দেশ্য, মেয়েদের জন্য স্কুল গড়বেন। মেয়ে চাই। কয়েকটি মেয়ে জুটল। তাদের মধ্যে প্রমীলা ও হিরণ্ময়ী বসুর সব বিষয়ে আগ্রহ। লেখাপড়া, খেলাধুলা সূচীশিল্প—সব কিছুতে। অমিয় মহারাজ (স্বামী গণেশানন্দ) তাদের সেবার মন্ত্রেও দীক্ষা দিলেন। আর কানে কানে বললেন, 'বাঙালী মেয়ের অবলার অপবাদ তোমাদের দূর করতে হবে—শক্তির প্রতিমূর্তি তোমরা, শক্তির আরাধনা করে সবলা হতে হবে।'

তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরিষা আশ্রমে আরম্ভ হল শরীর চর্চার পাঠ—খেলাধূলার অঢেল অয়োজন। হিরণ্ময়ী বসু দৌড়ে, প্রমীলা বসু লোহার বল, ক্রিকেট বল ও বর্শা ছোঁড়ায় নানা স্পোর্টস থেকে প্রাইজ এনে আশ্রম ভর্তি করতে আরম্ভ করলেন। ফিল্ড ইভেণ্টে বিভিন্ন স্পোর্টসে প্রমীলা বসু কখনো ফার্স্ট, কখনো সেকেণ্ড, রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকবারের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রমীলা, হিরণ্ময়ী বসুর কৃতিত্বে সরিষা সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের বহুবার চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রমীলা বসুর স্পোর্টসের রেকর্ডের কথা আজ আর লিখে লাভ নেই। তেইশ চব্বিশ বছর আগের রেকর্ড আজ নবাগতদের নতুন কৃতিত্বে ম্লান হয়ে গেছে।

স্পোর্টস ছেড়ে দেবার সতেরো আঠারো বছর পরের একটি ঘটনা ঃ

১৯৫৫ সালে দেখি প্রমীলা বসু হাতে বর্শা নিয়ে প্র্যাক্‌টিশ করছেন। বললাম—'বর্শা ছোঁড়ার বয়স কি আর আছে?' উত্তরে বললেন—'নেই সত্যি, তবে আজ যা স্ট্যাণ্ডার্ড দেখছি, তাঁতে একটু চেষ্টা করলে এখনো হয়তো কিছু করতে পারি।' সত্যি করলেনও। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে সেবার বর্শা ছোঁড়ায় অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান।

লক্ষ্মীকান্তপুরের কাছাকাছি চাঁদপুর ঘাটেশ্বরের ৺রাজেন বসুর মেয়ে। অমিয় মহারাজের কাছে সেবামন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর সেবা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্রীজীবন কাটিয়ে এসেছেন। নিজে ঘর বাঁধেননি। বাঁধবার বাসনাও নেই।

বাবা চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। প্রমীলা বসু যখন সারদা মন্দিরের ক্লাস ফোর-এর ছাত্রী, তখন একদিন স্কুলে খবর এল বাড়িতে বাবা ভীষণ অসুস্থ। এখনই প্রমীলাকে বাড়ি যেতে হবে। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখেন ধোপ-দুরস্ত পোশাকপরা দু তিনজন নতুন অতিথি বাড়িতে এসে গ্যাট হয়ে বসে আছে প্রমীলাকে দেখবে বলে। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে স্কুলে চলে এলেন। বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। মেয়ের বেয়াদপি তিনি সহ্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। বহুদিন বাপ-মেয়ের দেখা নেই। প্রমীলা হলেন আশ্রমবাসিনী।

একদিন চাটার্জিপাড়ার এক কৈবর্ত বাড়িতে রাত্রে আগুন লাগতে প্রমীলারা দল বেঁধে স্কুল থেকে গেলেন আগুন নেভাতে। প্রমীলার বাবাও এলেন অন্য পাড়া থেকে। আগুন নিবল। সেই সঙ্গে প্রমীলাকে দেখে বাবারও রাগ পড়ল।

আর একবার প্রমীলার বড়বোন মারা যেতে ভগিনীপতির সঙ্গে প্রমীলার বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেবাব্রতী প্রমীলা সে পথে পা বাড়াননি। ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর অমিয় মহারাজের আদর্শে ঐ স্কুলেই নিয়েছিলেন শিক্ষার ভার। খেলাধুলা

পরিচালনার সমস্ত ভারই মহারাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রমীলার উপর।

মহারাজ মরজগৎ থেকে সরে যাবার পর প্রমীলাও স্কুল থেকে সরে যান। কিছুদিন হাওড়ার একটি স্কুলে কাজ করবার পর এখন এসেছেন কলকাতায়।

নানা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ শারীর শিক্ষক সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী। বাৎসরিক শিক্ষাশিবিরের বহুবারের শিবিরাধ্যক্ষা, এন সি সির লেডি অফিসার, স্কুলস গেমে বাঙলা স্কুল টীমের পরিচালিকা।

মা ও বড়বোনের দুই ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট সংসার প্রমীলা বসুর। অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হবার ভয়ে যে ভগিনীপতিকে বিমুখ করেছিলেন, তাঁর দুই ছেলেকে নিয়েই আজ প্রমীলার সংসার। তবে খেলার ডাকে সব সময়ই প্রমীলার সাড়া মেলে। সেবার দীক্ষাও জীবনের মূল মন্ত্র।

সাঁতারের দুই সহোদরা



ভারতী সাহা

আরতি ও ভারতী। নদী-মাতৃক বাঙলা দেশের মাতৃহারা দুই সাঁতারু মেয়ে। অনেকে মনে করতেন সাঁতারের দুই যমজ মেয়ে। কিন্তু যমজ নয়। বরং জলজ বলা যায়। অবশ্য বুৎপত্তি-গত অর্থে নয়—কার্যকারণে।

জলের কুলে বাস। গঙ্গায় প্রথম সাঁতার শেখা। জলের বুকে কলতান তুলে দুজনের যশ ও খ্যাতি।

আর স্বভাবে? প্রায় যমজের মত। দুজনেরই নেশা খেলাধূলা। সাঁতারেই অনুরাগ বেশী। সাঁতারের সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতিষ্ঠিত ক্লাব হাটখোলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তরবারি খেলা, সাইকেল চালনা—সব কিছুতে পারদর্শিনী হবার চেষ্টা।

দু'য়ের মধ্যে আরতি বড়, ভারতী ছোট। বয়সের ব্যবধান আড়াই বছর। উচ্চতার ব্যবধান দেড় ইঞ্চি। এখানে কিন্তু বড় ভারতী। দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। আরতির ৫ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। আবার নামে আরতি অনেক উঁচুতে। দুরন্ত সাগর ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী এশিয়ার প্রথম মেয়ে। ভারত সরকারের কাছ থেকে সাগর জয়ের কৃতিত্বের নিদর্শনে 'পদ্মশ্রী' খেতাব প্রাপ্তা ভারতের কৃতী কন্যা আরতি।

আর ভারতী? শুধু কি দিদির গরবে গরবিনী?

না। সুযোগ ও সুবিধা পেলে ভারতীও হয়তো আরতি হতে

পারত। আরতির সঙ্গে সঙ্গেই উড়ত তার পরিচয় পতাকা। কিন্তু সে স্থযোগ ভারতীর জীবনে আসেনি।

সাঁতার সম্পর্কে যারা একটু ওয়াকিবহাল তাদের সবারই জানা আছে ফ্রি স্টাইলে এক সময়ে আরতির চেয়ে ভারতীর সুনাম ছিল বেশী। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে ফিরে এসে ছোট বোন ভারতীর কাছেই আরতিকে হার স্বীকার করে ফ্রি স্টাইলের প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসাবে সর্বভারতীয় সাঁতারে ভারতী রেকর্ড করেছিল আরতির সুনাম প্রতিষ্ঠারও আগে।

বাঙলার সাঁতারে অবশ্য আরতির সুনামই ভারতীকে সাঁতার শিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দিদির মত বড় হব, দিদির চেয়েও এগিয়ে যাব এই সংকল্প নিয়ে ভারতীও গঙ্গার বুকে সাঁতার শিখতে আরম্ভ করে কাকা বিশ্বনাথ সাহার কাছে। পরে হাটখোলা ক্লাবে ওকে সাঁতারে সু-পটু করে তোলেন দাদা যোগেন্দ্র নাথ সাহা, পরলোকগত বিজিতেন বসু ও শচীন নাগ।

ভারতী যখন শিশু পাঠশালার ক্লাস ফাইভের ছাত্রী—তখন ইণ্টার স্কুল সাঁতারে ওর প্রথম যোগদান। যখন সাধক রামপ্রসাদ-এ পড়ে, তখন স্কুলের সাঁতারে ও প্রধান। ইতিমধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বেশ কিছু হাতে এসে গেছে। ১৯৫১ সালে ওর সিনিয়র সাঁতারুর মর্যাদা এবং বিভিন্ন পুকুর ও পুলে দিদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রায় সব বিষয়েই দিদি ফার্স্ট ও সেকেণ্ড। দু'বোনের ৪ হাত ভরে পুরস্কার আহরণ। তবু ভারতীর মন ফাঁকা। দিদি যখন অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে বাঙলার একমাত্র মেয়ে প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লি বোম্বে যায় ও দিদিকে 'সী-অফ' করতে গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। ওর যাবার স্থযোগ হয় না।

১৯৫২ সালে মাদ্রাজের মেরিনা সুইমিং পুলে জাতীয় সাঁতার এবং তার ফলাফলের উপর হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে প্রতিনিধি নির্বাচন।

এতদিন আরতি একাই গেছে জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধি হয়ে, এবার আরতি-ভারতী দু'বোন বাঙলার প্রতিনিধি। লম্বা লম্বা হাত টেনে, লম্বা পায়ে জল ঠেলে তরতর করে এগিয়ে গিয়ে ভারতী ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম হল, নামের পাশে নতুন রেকর্ডেরও কৃতিত্ব। তবুও অলিম্পিক টীমে স্থান হল না। এবারও দিদির ডাক পড়ল অলিম্পিকে। সুতরাং আর এক দফা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভারতী। কিন্তু সংকল্প হল আরও দৃঢ়। দিদি ওর পথের কাঁটা। তাকে ওর মারতেই হবে। সত্যি মারলও। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের পর বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে পালা বদল। একশ ও দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলে ভারতী ফার্স্ট, আরতি সেকেণ্ড। ছোট বোনের কাছে মার খেয়ে সেই যে আরতি ফ্রি স্টাইল ছেড়েছে আর কোনদিন ফ্রি স্টাইলে প্রতিযোগিতা করেনি।

১৯৫২-র পর সাঁতার ক্ষেত্রে ভারতীর প্রতিষ্ঠা বেশী। সাঁতারের বিভিন্ন আসরের তো কথাই নেই, গঙ্গার বুকে ৪ বার ৭ মাইল সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট। একবার বোম্বের সাঁতার সম্রাজ্ঞী ডল নাজির এবং আরতিরও ওর কাছে পরাজয়। একবার বালি ব্রিজের স্টার্টিং পয়েন্টে নৌকোর সঙ্গে নৌকোর সঙ্ঘর্ষে ভারতীর আঙ্গুল ছেঁচে গেল। সেই জখমী আঙ্গুল নিয়ে সাঁতার কেটেও ফার্স্ট হল। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে। শ্রীরামপুরে, চাতরায় এবং এখানে ওখানে নানা সাঁতারেই ভারতী কৃতিত্ব দেখাতে লাগল। সর্বভারতীয় সাঁতারেও বাঙলার পক্ষ সমর্থনের জন্য ডাক এল পরপর কয়েক বছর। বাঙলার সাঁতার গগনে সন্ধ্যা চন্দ্রের উদয় না হওয়া পর্যন্ত ভারতী সাহাই ছিল মেয়েদের সাঁতারে সবার শ্রেষ্ঠ।

১৯৫৯ সালে আরতি যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য লণ্ডন যাবার জন্য প্রস্তুত তখন আবার ভারতীর মন নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেহও। যে বিমান দমদম থেকে আরতিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিমানের দিকে ও দৌড়ে গিয়েছিল লণ্ডন যাবে বলে।

কে যেন দেহটাকে টনে রেখেছিল, মনটা নাকি ওর দিদির সঙ্গেই চলে গিয়েছিল লণ্ডনে। স্বপ্নে দেখতো ও-ও নাকি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে।

দিদি আরতি গুপ্তার ঘরে বসেই এসব কথা হচ্ছিল ভারতীর সঙ্গে। কথা শুনে দিদি, মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন, আর ঘুরে ঘুরে ভারতীর চোখ পড়ছিল দেওয়ালে টাঙ্গানো প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে দিদির ছবির উপর, একবার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামাঙ্কিত 'পদ্মশ্রী' খেতাবের সনদের উপর। কতবার কতদিন ভারতী এ ছবি দেখেছে, কিন্তু ওর এ চাউনি দেখে মনে হল এমন করে আর বুঝি দেখে নি। ওদের ১৪।৪ বলরাম মজুমদার স্ট্রীটের বাড়িতে যে শ'দুই আড়াই স্পোর্টসের প্রাইজ আর এক গাদা প্রশংসাপত্র আছে তার সবের মূল্যের চেয়ে এর একখানার মূল্য যে অনেক বেশী ভারতী হয়তো সেই কথাটাই ভাবছিল ওর কৃতিত্বের হিসাব নিকাশের ক্ষণে।